জানবার কথা
আট

জানবার কথা

অষ্টম খণ্ড

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

মনীষা
লি মি টে ড

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর,১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৩৭২, রসা রোড সাউথ, কলকাতা ৩৩ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী, বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে

ভাষা ও সাহিত্য

দাঁড়াও। এক মিনিট।—

হয়েছে। আচ্ছা, বলো তো এই এক মিনিট আমি কী ভাবছিলাম? হাজার মাথা খুঁড়লেও বলতে পারবে না।

আমি জানালে পরে তবেই তুমি জানতে পারো। না জানালে কেমন করে জানবে? জানাবার এই উপায়টার নামই ভাষা।

তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে চীৎকার করলেও তোমার কানে যাবে না।

তাহলে উপায়? উপায় আমার হাতেই আছে। মুখের ভাষাটাকে যদি কোনো কিছুতে ধ'রে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলেই আর কোনো মুশকিল থাকে না। ভাষা পৌঁছে দেবার এই উপায়টার নামই লেখা।

জানবার আর জানাবার কিসের এতো মাথাব্যথা? চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই হয়! চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মানুষ আর মানুষ হতে

পারতো না। আজও ল্যাজ উঁচু করে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হতো।

হাতের জোরেই মানুষ পেরেছে জানতে আর জানাতে ; শিখেছে কথা বলতে, নাচগান করতে, কবিতা বানাতে। কাজ থেকেই এসেছে তাল-মান-ছন্দ।

শিল্প-সাহিত্য তাহলে আকাশ থেকে পড়েনি। সমাজ থেকেই উঠেছে। তার প্রমাণ ? এ বইতে পাওয়া যাবে অজস্র প্রমাণ।

সমাজের ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে। জলে যেমন গাছের ছায়া পড়ে ঠিক তেমনি ? না। শিল্প-সাহিত্য সমাজের অকর্মণ্য ছায়া নয়।

ভস্মলোচনের গল্প জানো ? ভস্মলোচন যা-কিছু দেখতো, তাই পুড়ে যেতো। যেদিন সে ছায়ার মধ্যে নিজেকে দেখলো, সেদিন নিজেই সে পুড়ে গেলো।

ভস্মলোচনের মতো যে সমাজ বেশির ভাগ মানুষকে দগ্ধায়, তার ছায়া ফুটিয়ে তুলে শিল্প-সাহিত্য সেই সমাজকে ধ্বংস করার কাজে হাত লাগাতে পারে।

তেমনি আবার নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন জীবনকে এগিয়ে আনবার কাজে সহায় হতে পারে শিল্প-সাহিত্য।

তার প্রমাণ ? এ বইতে তার অজস্র প্রমাণ।

এক কথায়, মানুষের হাত দেখে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা বলা।

হাতের মধ্যে কী আছে ? আছে কাজ, আছে কথা। মুঠোর মধ্যে ? জগৎ।

ভাষা

পাহাড় বোঝাতে যদি খোদ পাহাড়টাকে হাজির করতে হতো, তাহলে কী মুশকিলে পড়তে বলো তো? যদি ধরেও নিই তুমি মস্ত বড়ো বীর, তাহলেও কি রক্ষে ছিলো? তোমার ল্যাজ দেখবার জন্যে রীতিমত লোকের ভিড় জমে যেতো। কেননা গন্ধমাদন পাহাড়টা তুলে এনেছিলো কে? হনুমান না?

॥ বোঝা আর বোঝানো ॥

তার চেয়ে কাজটা বেজায় হাল্কা করে দিতে পারে পাথরের ছোট্ট একটা নুড়ি। যদি আমরা ঠিক করে নিই নুড়িটা সামনে ধরলেই পাহাড় বুঝবে—তাহলে আর পাহাড়টাকে নড়াবার কোনো দরকারই হয় না। তেমনি নদী বোঝাবার জন্যে একটা সুতো, গাছ বোঝাবার জন্যে একটা খড়্‌কে দিয়ে কাজ চলতে পারে।

কিন্তু ভারির বদলে হাল্কা, বড়োর বদলে ছোট্ট জিনিস দিয়ে বোঝাতে গেলেও সব সময় ঘাড়ে পর্বতপ্রমাণ মোট নিয়ে ঘুরতে হবে। কোনটা কখন বোঝানোর দরকার পড়ে বলা তো যায় না, কাজেই কোনো জিনিসই বাদ দেওয়া চলবে না।

ধরো, রাস্তা দিয়ে তুমি যাচ্ছো। একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। লোকটাকে দাঁড় করিয়ে তুমি গাছের কথা বলতে চাও। তার জন্যে কিন্তু ঝুলি থেকে খড়্‌কেটা বার করতে হবে। লোক-টাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুমি ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে

খড়্‌কেটা খুঁজতে লাগলে। নুড়ি পাওয়া যাচ্ছে, সুতো পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু হাজারগণ্ডা জিনিসের ভিড়ে খড়্‌কেটা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সেটা পাওয়া গেলো, তখন দেখলে যাকে বোঝানোর জন্যে এতো কাণ্ড সে লোকটা হয়রান হয়ে অনেক আগেই কেটে পড়েছে।

॥ যা সঙ্গে আছে ॥

কাজেই, বোঝাবার জন্যে অমন বোঝা ঘাড়ে করা চলবে না। যা সব সময় সঙ্গে আছে, বয়ে বেড়ানোর হাঙ্গামা নেই, হারিয়ে ফেলার ভয় নেই—তেমন কিছু হলেই সুবিধে। তেমন জিনিস কী আছে? আমাদের হাত, পা, চোখ, মুখ—এক কথায়, আমাদের শরীরটা। পৃথিবীর সব থেকে ভুলো লোকের পক্ষেও নিজের একখানা হাত, কিংবা একটা ঠ্যাং ভুলে ফেলে আসা সম্ভব নয়। তুমি যেখানেই যাও, শরীরটা সঙ্গে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জানাবার সব থেকে ভালো উপায় শরীরটাই আমাদের জুটিয়ে দিতে পারে। তোমাকে হাত দিয়ে বক দেখিয়ে দিতে পারি। বুড়ো আঙুল দিয়ে কলা দেখাতে পারি। ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিতে পারি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। এক কথায়, অঙ্গভঙ্গি করে জানাতে পারি। পাহাড় বোঝাবার জন্যে পাথরের নুড়ির বদলে হাত মুঠো করে দেখিয়ে দিলেই চলে।

কিন্তু মনে করো, তুমি আছো পাশের ঘরে। তোমাকে আমার দরকার। যদি হাত নেড়ে ইশারা করি, তুমি জানতেই

পারবে না। অথচ হাততালি দিলে তুমি পাশের ঘর থেকেও শুনতে পাবে। তার মানে ইশারার চেয়ে আওয়াজ করতে পারলে সুবিধে অনেক বেশি।

॥ হাতে নয়, মুখে ॥

জানাবার জিনিস যে কতো আছে, তার ইয়ত্তা নেই। তার জন্যে তেমনি রকমারি আওয়াজ দরকার। হাততালি দিয়ে তুমি ক'রকমের আওয়াজ করতে পারো? চেষ্টা করে দেখো তো? নিশ্চয় বেশি নয়। তাছাড়া ধরো, এক হাতে চায়ের কাপ ধরে আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করতে চাও, 'চা খাবেন?' প্রশ্নটা ঐ অবস্থায় হাততালি দিয়ে জানাতে গেলে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে ভাবো তো?

তাহলে এখন উপায়? জানাবার উপায়টা মানুষের হাতে নেই। উপায়টা আছে মানুষের মুখে।

ফুস্‌ফুসের হাওয়াটাকে গলা, জিভ, টাক্‌রা, দাঁত, ঠোঁট —মুখের ভেতর নানা জায়গায় খেলিয়ে মানুষ যতো রকমের খুশি আওয়াজ করতে পারে। হাত জোড়া থাকলেও মুখে আওয়াজ করতে কোনোই বাধা নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইশারা করার চেয়ে আওয়াজ করলে সব দিক থেকেই জানাবার সুবিধে। আওয়াজ করে জানাবার নামই হলো ভাষা।

টাপুর টুপুর শব্দ শুনেই ঘরে বসে বুঝলাম বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। টাপুর টুপুর শব্দটা কি বৃষ্টির ভাষা? না। টিপ

করে শব্দ হতেই বুঝলাম, তাল পড়লো। ঢিপ্ শব্দটা কি তালের ভাষা? না। আওয়াজ হলেই ভাষা হয় না, জানাবার জন্যে আওয়াজ করলে তবেই ভাষা হয়। আওয়াজ হওয়া আর আওয়াজ করার মধ্যে তফাত আছে।

পশুপাখিরাও তো আওয়াজ করে জানায়। বাছুরকে দেখতে না পেলে গোরু চীৎকার করে ডাকে; কাক তার দলের সঙ্গীদের ডেকে ডেকে জড়ো করে। তাহলে কি বলবো, পশুপাখিদের ভাষা আছে?

॥ ভাব আর ভাষা ॥

না। পশুপাখিদের ডাক আছে, ভাষা নেই। ওদের আওয়াজগুলো অস্ফুট, ছাড়া-ছাড়া আওয়াজ। যেমন: 'ঘেউ-ঘেউ', 'কা-কা', 'হাম্-বা', 'ব্যা-ব্যা'। যেমন, আমরা ব্যথা লাগলে বলি 'উঃ', ভালো লাগলে বলি 'বাঃ', লজ্জা পেলে বলি 'ধ্যেৎ'।

মানুষ যদি 'উঃ-আঃ-বাঃ-ইস্-ছিঃ-ধ্যেৎ' ছাড়া কিছু বলতে না পারতো, তাহলে কিছুতেই এ কথা বলা যেতো না যে, মানুষের ভাষা আছে। নানা রকমের আওয়াজ একসঙ্গে গেঁথে স্পষ্ট ভাব স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলাই হলো ভাষার কাজ।

তোমাদের বাড়িতে কেউ গেলে তোমাদের কুকুরটা বলতেই পারবে না: 'কাকে চাই?' কিন্তু তোমাদের যদি তোতাপাখি থাকতো, সে হুবহু মানুষের গলায় বলে উঠতো: 'কাকে চাই?' শেখালে আরও অনেক কথাই সে বলতে পারে। তাহলে কি

বলবো, তোতাপাখির ভাষা আছে?

না। তোতাপাখি হুবহু মানুষের ভাষা নকল করতে পারে। তাই সেই নকল-করা বুলিটা তার ভাষা নয়। প্রত্যেকটা কথার ঠিকঠাক মানে তার জানা নেই। তাই তোতাপাখি কথা বলে না, শেখানো বুলি আওড়ায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কথা বলার যন্ত্র থাকলেই হলো না। যন্ত্রটাকে কাজে লাগালে তবেই তা থেকে ভাষা হয়।

॥ কথা আর কাজ ॥

কাজ করবার মুরোদ একমাত্র মানুষেরই আছে। মানুষই শুধু পেরেছে বাইরের জগৎটাকে নিজের দখলে আনতে। তার জন্যে হাত আর মাথার মধ্যে মিল থাকা দরকার। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একা এঁটে ওঠা কখনই সম্ভব নয়; তাই মানুষকে দল বেঁধে লড়তে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এই দল পাকিয়ে লড়াই করার নামই হলো কাজ করা।

মিলে মিশে কাজ করার জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই নাম সমাজ। তার জন্যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা দরকার, মন-জানাজানি হওয়া দরকার। নইলে কোনো কাজই করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, বোঝানো আর জানানোর কাজটা সব থেকে ভালো হয় মুখে বললে। সমাজের কাজে লাগবে বলেই ভাষার দরকার পড়েছে। সমাজ যদি না থাকতো ভাষা থাকতো না। তেমনি ভাষা যদি না থাকতো সমাজ গড়া সম্ভবই হতো

না। কাজের সঙ্গে কথা, কথার সঙ্গে কাজ—একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না। কথা ছাড়া কাজ এগোয় না; তেমনি কাজে না লাগলে কথা হয় শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ।

॥ ভাষার মালমশলা ॥

বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন মালমশলার দরকার হয়, তেমনি ভাষার মালমশলা হলো শব্দ বা কথা। কথা ছাড়া ভাষা হয় না। তেমনি রকমারি আওয়াজ একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয় একেকটি শব্দ বা কথা। 'প্' 'আ' 'হ্' 'আ' 'ড়্'—এতোগুলো আলাদা আলাদা আওয়াজ একসঙ্গে গেঁথে তৈরি হলো একটি শব্দ— 'পাহাড়'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাহাড় বোঝাতে গেলে 'পাহাড়' কথা-টুকুই যথেষ্ট। বস্তু কিংবা ভাব—যাই বোঝাতে চাই না কেন, শব্দ দিয়েই তা বোঝানো যায়। শব্দ করে বলতে সময়ও লাগে খুব কম। আস্তে কথা বললেও সেকেণ্ডে কম করে চোদ্দটা আওয়াজ করা যায়।

রকমারি আওয়াজ জুড়লেই কি শব্দ হবে? ধরো, আমি বললাম : 'রহাব্যব' কিংবা 'শেত্বষবি'। কিছু বোঝা গেলো? কিছুই বোঝা গেলো না। কিন্তু ঐ আওয়াজগুলোকেই অন্যভাবে সাজিয়ে যখন বললাম 'ব্যবহার' কিংবা 'বিশেষত্ব', তখনই সেগুলো হলো শব্দ—কেননা কথাগুলোর মানে আছে। মানে থাকলে তবেই হবে শব্দ।

একটা ভাষায় যেটা শব্দ, অন্য ভাষায় সেটা শব্দ নাও হতে পারে। যেমন, ইংরিজিতে 'কারেজ' একটা শব্দ—বাঙলায় ওটা শব্দই নয়। আবার তেমনি 'গান' শব্দটা ইংরেজীতেও আছে, বাঙলাতেও আছে। কিন্তু দুটোর মানে একদম আলাদা। ইংরেজী 'গান্'-এর আওয়াজ হলে লোকে ছুটে পালায়, কিন্তু বাঙলা 'গান' শুনবার জন্যে লোক ছুটে আসে।

॥ জানার উপায় ॥

শব্দের কাজই হলো কোনো কিছু বলে দেওয়া। বাইরের জগৎটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একেবারে গোড়ার যুগে মানুষের কাছে প্রকৃতির ধরনধারন ছিলো একদম অচেনা। প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে গিয়ে মানুষ অনেক কিছু জানতে পেরেছে। প্রকৃতির কিছু জিনিস নড়ে যেমন : পশু-পাখি-মানুষ ; কিছু জিনিস নড়তে পারে না : যেমন পাথর-মাটি-ভাঙা গাছের ডাল। কিছু জিনিস শক্ত : যেমন পাথর ; কিছু জিনিস নরম : যেমন কাদা, মাটি।

তার মানে, বিশ্বপ্রকৃতিকে একাকার করে দেখা নয়—তার মধ্যেকার আলাদা আলাদা বস্তুগুলোকে খুঁটিয়ে দেখা, তাদের ভাবগতিকগুলো লক্ষ্য করা। ধরো, একটা বনের মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকেই ধাঁধাঁ লেগে গেলো। তাকিয়ে দেখলাম, সার বেঁধে কী সব যেন অচল অবস্থায় মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম দেখতে যারা, অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করে তাদের এক কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'গাছ'। এবার আরও খুঁটিয়ে

দেখলাম সব গাছ এক নয়। যে-সব গাছ এক জাতের, তাদের অন্য সব গাছ থেকে আলাদা করে একেক কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'শাল' তাল' 'বট' 'অশথ'।

॥ শব্দ দিয়ে চেনা ॥

বাছাই করা আর সাজানো—চেনবার আর জানবার এই হলো উপায়। শুধু যদি বেছে বেছে গাছ দেখি, তাহলে বন দেখতে পাবো না ; আলাদা আলাদা গাছ এক জায়গায় মেলালে তবেই বনটাকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু জানা কিংবা চেনা মানেই হলো বাদবাকিদের থেকে আলাদা করা। যাতে অন্য সব কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে না যায়, তার জন্যে যেটাকে চিনছি, সেটার গায়ে আলাদা একটা লেবেল আঁটা দরকার। কিন্তু ধারণার গায়ে তো লেবেল আঁটা যায় না। কাজেই নাম দিয়ে লেবেল আঁটার কাজটা দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যায়। নামটাই হবে বস্তু কিংবা ভাবের চিহ্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে চিনতে গেলে নাম দিতে হয়। নামটাই চিনিয়ে দেয়। এই নামটাই হলো শব্দ। শব্দের দৌলতেই আমরা জগৎটাকে চিনি। শব্দ ছাড়া ভাবাই যায় না।

॥ শব্দের দিগ্বিজয় ॥

শুধু বস্তু নয়, বস্তুর ভাবগতিকগুলো চিনতে গেলেও নামের দরকার। মানুষ ছুটছে, কুকুর ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে—এ থেকে ছোটার ভাবগুলো, মানুষ-কুকুর-ঘোড়া থেকে আলাদা করে নিয়ে একটা কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'ছোটা'।

শুধু বস্তুকে জানলেই হবে না, তার গুণগুলো জানাও দরকার। কোন্ বস্তু, কটা বস্তু, পুরুষ না স্ত্রী, কী অবস্থায় আছে—শব্দ দিয়েই তা বোঝানো যায়।

পৃথিবীতে বস্তু আছে অসংখ্য, তার ভাবও তেমনি অসংখ্য। প্রত্যেকটার জন্যে যদি আলাদা আলাদা শব্দ ঠিক করতে হতো, তাহ্লে শব্দের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকতো না। যেমন ধরো, লাল কুকুর, কালো কুকুর, ছোটো কুকুর, বড়ো কুকুর, শুয়ে-থাকা কুকুর, বসে-থাকা কুকুর—প্রত্যেকটার জন্যে যদি আলাদা আলাদা শব্দের দরকার হতো, তাহলে কী মুশকিলে পড়তে বলো তো? লালই হোক, কালোই হোক, ছোটোই হোক, বড়োই হোক, শুয়েই থাক আর বসেই থাক—কুকুর ছাড়া তো কিছু নয়। কাজেই 'কুকুরে'র সঙ্গে লাল, কালো, ছোটো, বড়ো, শুয়ে-থাকা, বসে-থাকা যোগ করে অনেক রকম ভাব বুঝিয়ে দেওয়া গেলো। ফলে, কম শব্দ দিয়ে অনেক রকমের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। এমনি-ভাবে গোটা তুনিয়াটাকে হাজার কয়েক শব্দের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ভরে ফেলা যায়।

॥ শব্দের গোড়ায় ॥

তাই সব ভাষাতেই শব্দের একটা মোটামুটি ধরাবাঁধা সংখ্যা থাকে। তারই ফলে, ভাষা শেখা সম্ভব হয়।

শব্দগুলো এলো কোথা থেকে? একেবারে গোড়ার যুগের মানুষ হয়তো পশুপাখির আওয়াজ নকল করে শব্দ গড়েছিলো। কাক শব্দটা হয়তো কা-কা ডাক নকল করেই এসেছে, ঝঁ-ঝিঁ

আওয়াজ নকল করেই হয়তো ঝিঁঝিপোকা নামটা এসেছে। ছোটো ছেলেরা যেমন বেড়ালের নাম দেয় 'ম্যাও', কুকুরকে বলে 'ঘেউ-ঘেউ', শেয়ালকে বলে 'হুক্কা-হুয়া'।

কিন্তু এই ধরনের আওয়াজ-নকল-করা শব্দ ভাষার মধ্যে খুবই কম থাকে। বেশির ভাগ শব্দই মানুষ দরকারমতো তৈরি করে নিয়েছে। সমাজের সবাই সেই শব্দগুলোকে মেনে নিলে তবেই সেগুলো ভাষার মধ্যে জায়গা পায়।

কতকগুলো শব্দ আছে, যেগুলো হলো ভাষার বনিয়াদ। এই শব্দগুলোকে ভর করে নতুন নতুন শব্দ গড়ে তোলা হয়। এ গুলোকে বলা হয় শব্দের মূল-ধাতু। প্রত্যেকটা মূল-ধাতুই কোনো-না-কোনো ক্রিয়া বোঝায়। কথা কিভাবে কাজ থেকে এসেছে এই মূল-ধাতুগুলো পরখ করে দেখলেই বোঝা যায়।

॥ কাজ থেকে কথা ॥

মূল-ধাতুগুলো দিয়ে যে-সব কাজ বোঝানো হয়, তার প্রত্যেকটাই সমাজের কোনো-না-কোনো উৎপাদনের কাজ। এই কাজগুলো থেকে নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বহু শব্দের মধ্যেই তার ছাপ পাওয়া যায়।

যেমন 'বেত্র' কথাটার পেছনে আছে সংস্কৃতের একটি মূল-ধাতু 'বে'। 'বে' ধাতুর মানে, বয়ন করা বা বোনা। আদিম কালে গাছের ডালের মধ্যে ডাল গলিয়ে দিয়ে ঘরের বেড়া আর চাল বোনা হতো। পরে মানুষ আরও এগিয়ে গেলো। কাপড় বুনতে লাগলো, সুতো কাটতে লাগলো, সেলাই করতে

লাগলো, পশমের জামা বুনতে লাগলো। এক রকমের কাজ থেকে আরও রকমারি কাজ দেখা দিলো।

'মর্' মানে পিষে ফেলা, গুঁড়োনো, ঘষা, রেণু রেণু করা। এ থেকে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন শব্দ : মৃত্যু, মৃত, মর্ত, মর্দন, মৃগ। একটু ভাবলেই কথাগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

'বর্ণ' (রং) এসেছে 'বর্' থেকে। 'বর্' মানে ঢেকে দেওয়া। মূল-ধাতুগুলো শুধু সেই সেই কাজ এবং অবস্থার কথা বলে, মানুষ যা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, যার গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ পায়। আবার এইভাবে ধাতু দিয়েই তৈরি হয় এমন এমন ভাব, যা শুধু ধারণার ব্যাপার। এমনিভাবে ভেজানো, ঘা দেওয়া, তেলানো, গলানো, নরম করা, মিল করা, খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি কাজের কথাগুলো দিয়ে অনেক রকম মনের ভাবই আমরা প্রকাশ করে থাকি। যেমন : মন ভেজানো, মন গলানো, ঘা দিয়ে বলা, হিংসেয় পোড়া।

'অশ' বলতে বোঝায় তীক্ষ্ণতা, দ্রুততা, চোখালো ভাব। খুব দ্রুত ছোটে তাই ঘোড়ার নাম হলো 'অশ্ব'। ধারালো দৃষ্টির জন্যে চোখ হলো 'অক্ষি'। 'দর' বলতে বোঝায় ছেঁড়া কিংবা কাটা। চেরা হয় বা কাটা হয়, এই অর্থে গাছ হলো 'দ্রু' বা 'দারু'।

এমনিভাবেই মূল-ধাতুগুলোকে ভর করে তৈরি হয় নতুন নতুন শব্দ। সেই সঙ্গে অন্য সমাজের মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ভেতর দিয়ে অন্য ভাষা থেকেও আসে অনেক রকমারি শব্দ।

॥ ভোল বদল ॥

বাঙলা শব্দ তাই দু-জাতের : মৌলিক আর আগন্তুক। মৌলিক শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত থেকে। কিন্তু তাদের চেহারা সব সময় এক থাকেনি। বেশির ভাগ শব্দই মুখে মুখে এমনভাবে বদলেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সংস্কৃতের বংশধর বলে চেনাই যায় না। যেমন : 'উপাধ্যায়' বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে বাঙলায় হয়ে গেছে 'ওঝা' এবং 'রোজা'; 'ইন্দ্রাগার' হয়েছে 'ইঁদারা,' 'খাদ্য' হয়েছে 'খাজা'; 'অলাবু' হয়েছে 'লাউ'; 'বিস্ফোটক' হয়েছে 'বিষফোড়া'; 'টাকার কুবের' হয়েছে 'টাকার কুমির'। সংস্কৃতের মধ্যে যে-সব ভিন্ন বর্গের ভাষা ঢুকে পড়েছিলো, বাঙলা ভাষায় সেসব শব্দেরও ভোল বদ্‌লে গেছে। যেমন : গ্রীক 'দ্রাখ্‌মে' বাঙলায় এসে হয়েছে 'দাম'; দ্রাবিড় 'কোড' হয়েছে বাঙলায় 'ঘড়া'।

সংস্কৃতের কতকগুলো শব্দ বাঙলা ভাষার মধ্যে এসেও অবিকল এক আছে। যেমন : জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, অন্ন।

॥ দেশজ ও বিদেশী ॥

আগন্তুক শব্দগুলোর মধ্যে পড়ে : দেশজ এবং বিদেশী। এই দেশেরই আদিবাসীদের ভাষায় যে-সব শব্দ ছিলো, সেইগুলোই হলো দেশজ। যেমন : ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ঝাঁটা, ঝোল, ঢিল, ঢেউ। এ-ছাড়া আছে বিদেশী শব্দ : যেমন ফারসী থেকে এসেছে হাওয়া, লাল, জমি, আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, খেয়াল। তুর্কী থেকে এসেছে আলখাল্লা, কাঁচি, কাবু, কুলি, বোঁচকা। পোর্তুগীজ থেকে এসেছে কাবার, আলপিন, আলকাতরা, নোনা,

আলমারি, বালতি, বাসন, কেরানি, গুদাম, গীর্জা। ওলন্দাজ থেকে এসেছে হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ, ইস্‌ক্রুপ। ফরাসী থেকে এসেছে কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ। ইংরেজী থেকে এসেছে লাট, আপিস, লম্প, গেলাস, গারদ, সান্ত্রী, টিকিট, ইষ্টিশান, টেবিল, চেয়ার।

শুধু শব্দ নয়, বাঙলা ভাষায় অনেক বিদেশী প্রত্যয়-উপসর্গেরও আমদানি হয়েছে। যেমন : ফারসী 'বে' (বেবন্দোবস্ত, বেহাত), 'ফি' (ফি-হপ্তা, ফি-বছর) এবং ইংরেজী 'হাফ' (হাফ-আখড়াই, হাফ-হাতা), 'ফুল' (ফুল-মোজা, ফুল-হাতা), 'হেড' (হেড-পণ্ডিত, হেড-মিস্ত্রি) যোগ করে। কথার শেষে ফারসী 'আনা' (বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা), 'গিরি' (কেরানিগিরি, বাবুগিরি) 'দার' (অংশীদার, বাজনদার), 'বাজ' (মতলববাজ, যুদ্ধবাজ), 'সই' (টেঁকসই, জুতসই) যোগ করে।

॥ অর্থের বদল ॥

ভাষার মধ্যে যেমন নতুন নতুন শব্দ এসে জমা হয়, তেমনি আবার অনেক পুরোনো শব্দে নতুন নতুন অর্থ দেখা দেয়। যেমন, 'দারুণ' শব্দটা। গোড়ায় তার মানে ছিলো দারু বা কাঠের তৈরি; পরে তার মানে হলো 'কাঠের তৈরি জিনিসের মতো কঠিন'। তারপর হলো 'অত্যন্ত কঠিন'। শেষ কালে 'কঠিন' বাদ গিয়ে হ'য়ে দাঁড়ালো 'অত্যন্ত।' ফলে, আজকাল আর আমাদের দারুণ ভালো লাগলো বলতে বাধে না। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন ইরানে 'দইব' শব্দের অর্থ ছিলো 'দেবতা' ; পরে তার অর্থ

হয়ে দাঁড়ালো 'দৈত্য, রাক্ষস'। তেমনি গ্রীক 'দেমন্' শব্দের অর্থ 'দেবতা' ; খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকদের কাছে তার মানে বদলে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো 'দৈত্য, রাক্ষস'। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষই দেবতাকে সৃষ্টি করে, আবার মানুষই তাকে ভাঙে।

যখন কেউ বলে তোমার অনেক গুণ আছে, শুনে নিশ্চয় খুশি হও। কিন্তু 'গুণ' কথাটার মূলে রয়েছে যে 'গো' শব্দটা, তার মানে কিন্তু গোরু। এখন কেউ গুণের কথা তুললে নিশ্চয় তোমার রাগ হবে। কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। গোরুর কাছ থেকে এলেও 'গুণ' আজ 'গোরু'র সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখে না।

ভাষা তৈরির মালমশলা হলো এই ধরনের সব রকমারি শব্দ। তাহলে শব্দগুলোকে পাশাপাশি বসালেই কি ভাষা তৈরি হয়ে যাবে?

॥ সম্পর্ক পাতানো ॥

ধরো, আমি পরপর কতকগুলো শব্দ বসিয়ে গেলাম : 'ঢেঁকিরে নাহি কত মানে, ধান বুঝাব বুঝাব ভানে অবুঝে নিত্য বুঝ কত'। কিছু বুঝতে পারলে? শুনে নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে।

আচ্ছা, এবার ঐ কথাগুলোকেই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছি : 'অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।' এবার নিশ্চয় বোঝা গেলো? তাই বলে মনে কোরো না আমি তোমাকে ঢেঁকি বলছি।

সাজানো মানেই হলো আলাদা আলাদা জিনিসের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক পাতানো। শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক

পাতালে হয় বাক্য। আমি যদি তোমাকে বলি : 'আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা দাও', বলা মানেই সম্পর্কে আসা। কিন্তু তোমার সঙ্গে সম্পর্কে আসতে গেলে আগে 'আমি' 'তুমি' 'পেন্সিল' 'লাল' 'দেওয়া'—এই আলাদা আলাদা কথাগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক পাতানো দরকার। শব্দগুলো কী নিয়মে পাশাপাশি বসবে, ব্যাকরণই তা ঠিক করে দেয়। ভাব প্রকাশ করতে গেলে শব্দগুলোকে ব্যাকরণের শাসন মেনে চলতে হয়। ব্যাকরণ হলো ভাষার লাগাম।

পৃথিবীর সব মানুষ একই ভাষায় কথা বলে না। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার তফাত শুধু শব্দের দিক থেকেই নয়। শব্দ-গুলোকে বাঁধবার নিয়মের দিক থেকেও তফাত থাকে। ইংরেজীতে 'আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা দাও' বলা যাবে না ; বলতে হবে 'দাও আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা'।

॥ ভাষার আত্মীয়তা ॥

শব্দ আর ব্যাকরণের দিক থেকে ভাষার সঙ্গে ভাষার যেমন তফাত আছে, তেমনি আবার অনেক মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। যেসব পুরনো ভাষা থেকে আজকালকার ভাষাগুলো তৈরি হয়েছে সেইসব পুরনো ভাষাগুলোর মধ্যে আত্মীয়তা বিচার করে—তাদের একেকটি গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হয়েছে।

এর নাম ভাষার বংশ-পরিচয়। সংস্কৃত, আবেস্তীয়, লাতিন, আর্মানীয়, প্রাচীন ফার্সী, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন শ্লাবিক, প্রাচীন কেল্‌তিক, প্রাচীন জার্মানিক—এই ভাষাগুলোকে একটি গোষ্ঠীতে

ফেলে নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ভাষা-গোষ্ঠী আছে : সেমীয়-হামীয়, বান্টু, ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, ককেশীয়, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, ভোট-চীনীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, এস্‌কিমো আর আমেরিকার বিভিন্ন আদিম ভাষা-গোষ্ঠী।

কিছু পুরনো ভাষাকে কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায়নি : মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয়, পশ্চিম ইরানের শুশা অঞ্চলের ভাষা এলামীয়, পূর্ব মেসোপটেমিয়ার অঞ্চল-বিশেষের ভাষা মিতান্নি, ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা, ইতালির প্রাচীন ভাষা এত্রুস্কান। কিছু আধুনিক ভাষাকেও তেমনি কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় না : ফ্রান্স ও মধ্যবর্তী পীরেনীজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশের বাস্ক্, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশ্‌ম্যান আর হটেন্টট, জাপানী, কোরিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা।

॥ মিল আর অমিল ॥

এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার এই মিল দেখে আঁচ করা যায়, কোনো একটা সময়ে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। মাদাগাস্কারের ভাষার সঙ্গে মালয়ের ভাষার যে মিল, তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় কোনো একটা সময়ে মাদাগাস্কারের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ছিলো।

তাই বলে কোনো একটা লক্ষণ মিলে গেলেই একথা বলা যায় না যে, দুটো ভাষার মধ্যে নিশ্চয়ই যোগ ছিলো। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লিঙ্গের তফাত করা হয়, তেমনি আমেরিকার

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগের ভাষাতেও লিঙ্গভেদ আছে। আলাদা-আলাদা ভাবে গড়ে উঠলেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনো কোনো লক্ষণের মিল থাকতে পারে। সেইজন্যেই এটা কিছুতেই ধরে নেওয়া যায় না যে, সব ভাষাই গোড়াতে এক ভাষা ছিলো।

॥ জীবনের ছাপ ॥

ভাষার মধ্যে অনেক অতীত ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় 'উজবুক' বলে একটা কথা আছে। কথাটা এসেছে 'উজবেক' থেকে। মধ্যযুগে উজবেকিস্থানের কিছু লোক বাঙলা দেশে এসেছিলো। তার স্মৃতি 'উজবুক' কথাটার মধ্যে থেকে গেছে।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবনের ধরনধারন এবং ধ্যানধারণা কী রকমের ছিলো, ভাষার মধ্যেই তার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের ভাষায় 'গো' কথাটার ছড়াছড়ি—'গোত্র' থেকে শুরু করে 'গুণ', সব-কিছুর মধ্যেই গোরু বিরাজ করছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, এক কালে এ দেশের সমাজে পশুপালনের প্রাধান্য ছিলো। 'তোমাকে গোরু-খোঁজা করে খুঁজছিলাম'—এ কথা বললে নিশ্চয়ই তুমি রাগ করো না। কিন্তু যে সত্যিই গোরু খুঁজছে, তার কাজটাকে আজও যদি 'গবেষণা' বলে চালানো হয়—তা হলে এ কালের গবেষণাকারী পণ্ডিতরা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

ভাষা যেমন সমাজকে ধরে রাখে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়—তেমনি আবার ভাষার ওপর ভর করে সমাজও এগিয়ে যায়। সমাজের ওপর ভাষা ছাপ ফেলে।

লেখা

দিন দশেক বাদে আমাদের বাড়িতে বিরাট একটি ভোজ হবে। খুব খুশি হবো তুমি এলে। কিন্তু মনে করো, তোমার এমনই দশা যে, পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোয় না। তোমার কাছে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠানো বৃথা। তাই তোমাকে দশটা-গেরো-বাঁধা একটা দড়ি পাঠিয়ে বলে দিলাম, রোজ একটা করে গেরো খুলো। যেদিন গেরো খোলবার পর দেখবে দড়িতে আর একটাও গেরো নেই, সেদিন সটান নেমন্তন্ন-বাড়ি গিয়ে হাজির হবে।

॥ চিহ্ন দেওয়া ॥

নেমন্তন্নর কথা থাক। মনে করো, তুমি আর আমি এক জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে শিকার করতে গিয়েছি। হঠাৎ কোনো দরকারে আমাকে একবার এক সপ্তাহের জন্যে শহরে যেতে হলো। যাবার সময় তোমাকে আমি বলে গেলাম, তুমি এখানে থাকলে ; আমি ফিরে আসবার আগে যদি তুমি কোথাও চলে যাও, বিস্তারিতভাবে জানিয়ে যাবে এর মধ্যে এদিকে আর কোনো শিকারীর দল এসেছে কিনা। সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যেই কিন্তু তাঁবুতে ফিরে এসো। শহর থেকে ফিরে এসে দেখলাম তুমি নেই। তাঁবুর সামনে মাটিতে চারটে কাঠি পোঁতা রয়েছে। কাঠিগুলো দক্ষিণ দিকে হেলানো। তার পাশে গাছের একটা ভাঙা বড়ো ডাল পুব আকাশের দিকে নিশানা করা। কাছেই পড়ে আছে পাঁচটা টাটকা সবুজ পাতা। সেই

সঙ্গে আছে ঘোড়ার ল্যাজের ছটা চুল ; ল্যাজের ছুটি চুল দিয়ে হরিণের গায়ের একগোছা লোম জড়ানো।

তা থেকে কী বুঝবো ?—চারজন শিকারীর একটি দলকে পাঁচ দিন আগে সকাল বেলায় দক্ষিণ দিকে যেতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে ছিলো ছটি ঘোড়া। ছটি ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে তারা হরিণের মাংস নিয়ে গেছে।

লিখে জানানোর বদলে এইভাবে কতকগুলো চিহ্ন দিয়ে জানাবার রীতি আজও আমেরিকার কোনো কোনো আদিবাসী-দের মধ্যে আছে। এই সব চিহ্নগুলো যাদের জানা নেই, তারা কিন্তু চিহ্নগুলোর কোনো মানেই খুঁজে পাবে না।

॥ ছবি আঁকা ॥

তার চেয়ে ছবি এঁকে জানানো ঢের সহজ। ছবি দেখে যে-কেউ বুঝে নিতে পারে। তার জন্যে আগে থেকে চিহ্নগুলোর মানে জানবার দরকার হয় না। নিচে উত্তর আমেরিকার আদি-বাসীদের আঁকা একটা ছবি দেখো :
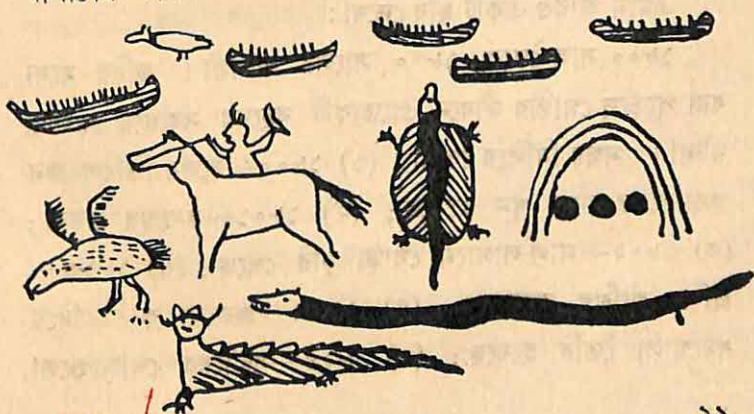
ছবিতে একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা বলা হয়েছে। জলপথে যাত্রা করেছিলো পাঁচটা ডিঙি। প্রথমটায় লোক ছিলো ষোলো জন, দ্বিতীয়টায় ন জন, তৃতীয়টায় দশ জন, চতুর্থ আর পঞ্চম ডিঙিতে আট জন করে লোক ছিলো। যতোগুলো লোক, ততোগুলো দাগ। সকলের আগের ডিঙির সর্দার 'মাছরাঙা' দলের লোক ; তাই ডিঙির মাথায় মাছরাঙার ছবি। তিন দিন সময় লেগেছিলো—ধনুকের মতো তিনটে দাগের কোলে তিনটে ফুটকি দিয়ে তিনদিনের সূর্য বোঝানো হয়েছে। ঘোড়সওয়ারটি হলো দলের জাদু-জানা লোক। সেও সঙ্গে গিয়েছিলো। কাছিম এঁকে বোঝানো হয়েছে যে, তারা নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছেছিলো। বাঁ দিকের ঈগল পাখিটা হলো সাহসের লক্ষণ ; নিচেকার আজ-গুবি প্রাণীগুলো দলটার সহায় ছিলো। অবশ্য ছবি দিয়ে বোঝানো হলেও প্রত্যেকটা ছবির মানে খুব স্পষ্ট নয়। ঘোড়ায়-চড়া লোকটা নৌকোর যাত্রীদের সঙ্গী হলো কেমন করে বোঝা যায় না।

এমনি আরও একটি ছবি দেখো :

১৮০০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের বর্ষপঞ্জী। ছবির মধ্যে ধরা পড়েছে গোষ্ঠীর জীবনে প্রত্যেকটি বছরের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। নম্বর মিলিয়ে দেখো : (১) ১৮০০—দলের তিরিশ জন অন্য দলের হাতে খুন হয়েছে ; (২) ১৮০১—বসন্তের মড়ক ; (৩) ১৮০২—নাল-লাগানো ঘোড়া চুরি গেছে ; (৪) ১৮১৩—হুপিং কাশির আক্রমণ ; (৫) ১৮১৭—শুকনো কাঠ দিয়ে ধর্মগোলা তৈরি হয়েছে ; (৬) ১৮২৪—সর্দারের ঘোড়াগুলো

মারা পড়েছে ; (৭) ১৮২৫—বানের জলে লোক ভেসে গেছে ; (৮) ১৮৪৮—ন্যুব্জপৃষ্ঠ নামে একজন বর্শার ফলকে খুন হয়েছে ; (৯) ১৮৫৩—স্পেনদেশ থেকে কম্বলের আমদানি হয়েছে ; (১০) ১৮৬৯—পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।

॥ ছবি লেখা ॥

কিন্তু ছবি এঁকে বোঝাতে গেলেও অসুবিধে আছে। একজন লোক মাছ ধ'রে রান্না করে খেলো : এটা বোঝাতে তিনবার তিন রকমের ভঙ্গিতে মানুষ আঁকতে হবে। তেমনি যদি ছবি এঁকে বোঝাতে হয় : সমুদ্রে নৌকোর মধ্যে বসে আছে একদল লোক—তাহলে দেখাতে হবে সমুদ্রের মধ্যে একটা নৌকো,

নৌকোর মধ্যে একদল লোক। ছবিতে নৌকো, জল আর একদল মানুষ একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করে দেখানো যাবে না।

কিন্তু যখন ছবি আঁকা হচ্ছে না, ছবিকে লেখার কাজে লাগানো হচ্ছে—তখন ধরা, রাঁধা, খাওয়া থেকে মানুষকে আলাদা না করে উপায় নেই। শুধু মানুষের একটা ছবি থাকবে। ছবিটা দেখলেই লোকে বুঝবে 'মানুষ'। সে কী করছে না করছে—তা দেখবার দরকার নেই। তেমনি মাছের একটি ছবি থাকবে। ছবিটা দেখলেই লোকে বুঝবে 'মাছ'।

তার মানে এ নয় যে, অবিকল একটি মাছ আঁকতে হবে। সংক্ষেপে এঁকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হলো। সংক্ষেপে মাছের রূপটা কী হবে, সেটাও বেঁধে দেওয়া দরকার, নইলে যে যার খুশিমতো মাছ আঁকবে। তাতে বোঝবার অসুবিধে হবে। বিভিন্ন দেশে ছক-বাঁধা মাছের ছবি কিভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখো :
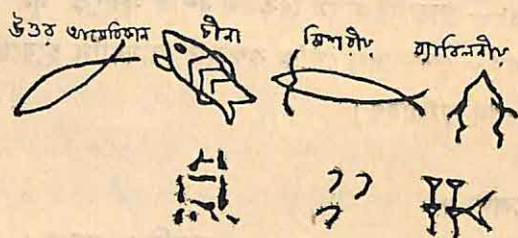
প্রথম লাইনে ছবিগুলো হচ্ছে একেবারে আদিম যুগের। মাছের ধাঁচটা ছবির মধ্যে স্পষ্ট। পরে সেই ছবি লেখায় যে চেহারা নিয়েছে, তার সঙ্গে মাছের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

॥ ধারণার ছবি ॥

মানুষ, মাছ—এসব তো চোখে দেখা যায়। কাজেই আঁকার মুশকিল নেই। কিন্তু যা চোখে দেখা যায় না, যার চেহারা নেই—তার ছবি হবে কেমন করে? যেমন: ধরা, রাঁধা, খাওয়া, সরু, মোটা, শক্ত, নরম, ভবিষ্যৎ, ভাগ্য—কোনোটা কাজ, কোনোটা গুণ, কোনোটা ধারণা। এদের আলাদা কোনো চেহারা নেই। কাজেই ছবি দিয়ে এইসব ভাব বোঝাতে গেলে, এদের একটা করে মন-গড়া চেহারা তৈরি করে নিতে হবে।

আজ থেকে হাজার চারেক বছর আগে মেসোপোটেমিয়ায় এই ধরনের ভাব ছবি দিয়ে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো দেখো:
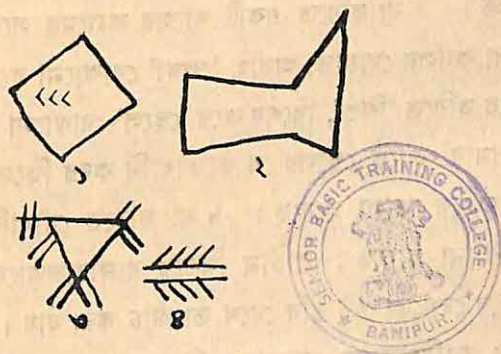
১ নং ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'মাস'। চৌকো ঘরটা হলো সূর্য; তার ভেতরে এককেটি দাগ দিয়ে দশ বোঝানো হচ্ছে। কাজেই গোটা ছবিটার মানে হলো তিরিশ দিন। ২ নং ছবিতে একটি পা দিয়ে 'দাঁড়ানো'র ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৩ নং

ছবিতে 'চেরা' বা 'কাটা' বোঝানো হচ্ছে। ৪নং ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'ভাগ্য'।

মিশরে কিভাবে ছবি দিয়ে বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলা হতো, নিচের ছবিতে দেখো :
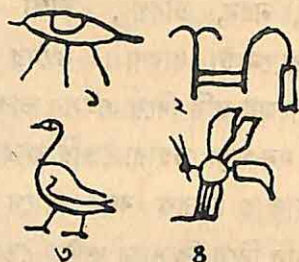
১ নং ছবিতে চোখ থেকে জল পড়ছে; অর্থাৎ 'কান্না' বোঝানো হচ্ছে। ২ নং ছবিতে একটি খাগের কলমের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা কালির দোয়াত, অর্থাৎ, 'লেখা' বোঝানো হচ্ছে। ৩ নং হাঁস দিয়ে ছবিতে 'শিশু', বিশেষ করে 'ছেলে' বোঝানো হচ্ছে; সেকালে বাপমার কাছে ছেলের যে কতোখানি কদর ছিলো, সুখাদ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৪ নং ছবিতে মৌমাছি দিয়ে 'রাজা' বোঝানো হয়েছে; প্রাচীন মিশরে রাজারাজড়াদের লোকে কী চোখে দেখতো এই ছবি দেখে তা আঁচ করা যায়। রাজার ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে সেকালের মিশরে বোধহয় বড়ো করে দেখা হতো না; কারণ তা যদি হতো, তাহলে তারা বাঘসিংহের ছবি দিয়ে রাজা বোঝাতো। রাজাকে মৌমাছির সমান করে দেখার মানে বোধহয় এখানে রাজার সংগঠনশক্তিকেই বড়ো করে দেখানো।

চীনদেশে লেখার ধরনে আজও ছবির ছাপ থেকে গেছে।

এখনকার দাগ দেখে ধরাই যাবে না কিসের ছবি। কিন্তু দাগগুলোর মানে থেকে বোঝা যাবে কিভাবে সেগুলো ছবি থেকেই এসেছে। নিচে এই রকমের চারটে কথার লিখিত রূপ দেখো :

১ নং ছবির মানে 'সকাল' ; একটি সরল রেখার মাথায় চার-কোণা 'সূর্য' ; সূর্য উঠেছে দিগন্তে। ২ নং ছবির মানে 'শব্দ, কথা' ; নিচে চৌকো ঘরটা হলো 'মুখে'র ছবি ; ওপরের আড়াআড়ি দাগগুলো দিয়ে মুখ থেকে আওয়াজ বার করবার ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৩ নং জোড়া ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'সুখী' ; প্রথম ছবিতে 'স্ত্রী', পরের ছবিতে 'সন্তান' ; মার কাছে সন্তান—এ থেকে সুখের ধারণা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ৪ নং জোড়া ছবিতে মোকর্দমা বোঝানো হচ্ছে। ছবির তিনটে অংশ ; প্রথম এবং শেষ অংশ—দুটোরই মানে 'কুকুর' ; মাঝখানে ছোটো করে আঁকা ২ নং ছবি—অর্থাৎ, 'কথা'। মামলা-মোকর্দমার ব্যাপারটা যেন দুটো কুকুরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ।

॥ ছবির সঙ্গে আওয়াজ ॥

এতোক্ষণ কেবল নির্বাক্ ছবির কথাই বলা হলো। যতোদিন

ছবির সঙ্গে শব্দের কোনো সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি, ততোদিন লেখা জিনিসটা ছিলো ভাষা থেকে আলাদা।

কিন্তু যে জিনিসটা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হতো, সেটা নিশ্চয় মুখের কথাতেও লোকে ফুটিয়ে তুলতো। যেমন, কোনো কথা জানাতে গেলে দুভাবে জানানো সম্ভব : (১) লিখে, অর্থাৎ ছবি এঁকে ; (১) কথা বলে, অর্থাৎ শব্দ দিয়ে।

গোড়ায় ছবি আর আওয়াজ ছিলো আলাদা। ক্রমে ছবি দিয়ে আওয়াজ বোঝানো হতে লাগলো। যেমন, একটা বইয়ের ছবি আঁকলাম আর তার পাশেই আরেকটা ঘড়ির ছবি আঁকলাম। প্রথমটায় হলো 'বই', দ্বিতীয়টার সময় অর্থে হলো 'কাল'। দুটো জুড়লে হবে পুঁথি আর সময় নয়—'বইকাল' অর্থাৎ 'বৈকাল'। এখানে দুটো ছবি দুটো শব্দ। দুটো শব্দ জুড়ে যে-মানে হচ্ছে, তার সঙ্গে ছবির কোনো সম্পর্ক নেই।

এমনিভাবে মিশরে সেকালে ছবি দিয়ে আওয়াজ বোঝানো হতো।

১ নং ছবিতে মুখ বোঝানো হচ্ছে। মুখকে বলা হতো 'র'। কাজেই 'র' শব্দটা বোঝাতে গেলে এমনি একটা ছবি আঁকলেই চলতো। ছবিটার আলাদা কোনো মানে আর থাকলো না ; ওটা হয়ে দাঁড়ালে 'র' আওয়াজের ছবি। তেমনি ২ নং ছবিতে

'কান' বোঝালেও মিশরীয় ভাষায় যেহেতু কানকে বলা হতো স্‌দ্‌ম্‌ সেইজন্যে এই ছবিতে শুধুমাত্র 'স্‌দ্‌ম্‌' আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। ৩ নং ছবিটা 'বাবুই পাখি'র। বাবুই পাখি মিশরীয় ভাষায় হলো 'উর'। কাজেই এখানে ছবিতে 'উর' আওয়াজ বোঝানো হচ্ছে।

মেক্সিকোর আজটেকদের লেখায় আবার একটু তফাত দেখা যায়। নিচে তিনটে ছবি দেখো। তিনটেই হলো শহরের নাম।
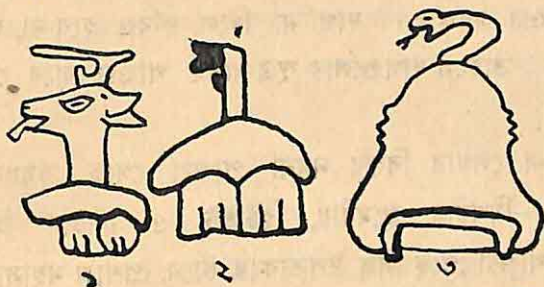
১ নং ও ২ নং—তুটোতেই ওপরকার অংশে হরিণের ছবি, নিচেকার অংশে দাঁতের ছবি। আজ্‌টেকরা হরিণকে বলে 'মাজাত্‌ল্‌', দাঁতকে বলে 'ৎলানৎলি'। কিন্তু এই তুটো শব্দ আস্ত জুড়ে শহরের নাম হয়নি। প্রথম শব্দটা থেকে নেওয়া হয়েছে 'মাজা', তেমনি দ্বিতীয় শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে 'ৎলান্‌'; এই তুটো ভাঙা অংশ জুড়ে শহরের নাম পাওয়া গেলো মাজাৎলান। শহরের নাম তুভাবে লেখা হয়েছে। ৩ নং ছবিতে শহরের নাম 'কোয়াতেপেক' বোঝানো হয়েছে; সাপ হ'লো 'কোয়াৎল্‌'; সাপটার নিচে পাহাড়; পাহাড় হলো 'তেপেক'। প্রথম শব্দটাকে ভেঙে শুধু 'কোয়া' রাখা হলো; দ্বিতীয় শব্দটা থাকলো আস্ত।

।। লিপি পাঠ ।।

মানুষের সভ্যতার একটি চিহ্ন হলো লিখতে শেখা। মনের ভাব লেখার মধ্যে ধরে রাখা। তারই জোরে মানুষ আজ এতোখানি এগোতে পেরেছে।

লেখা এগিয়েছে ধাপে ধাপে। আগে ছিলো ছবি, পরে হলো হরফ। দুটোর মধ্যে মিল কোথায়? দুটোর জন্যেই দাগ দেওয়া দরকার। দাগ না দিলে ছবিও হবে না, হরফও হবে না: তাহলে দাগগুলোর সূত্র ধরেই পাওয়া যাবে লেখার ইতিবৃত্ত।

পুরনো লেখার বিস্তর নমুনা পাওয়া গেছে ভূমধ্যসাগর এলাকায়—মিশরীয়, সুমেরীয়, হিটাইট ও ক্রীটান্ লিপি। এ ছাড়া পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকায়, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরের ঈষ্টার দ্বীপে, মেক্সিকোয় ও মধ্য আমেরিকায়।

মনে করো, কয়েক হাজার বছর আগের লেখার একটা নমুনা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেলো। কিন্তু সে লেখা কী করে পড়া যাবে? পড়তে গেলে আগে এমন একটি শব্দ জেনে নিতে হবে, যা নিশ্চয়ই ঐ অজানা লিপিতে লেখা আছে। শব্দটা কোনো কিছুর নাম হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ, নাম জিনিসটা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গেলেও খুব বেশি বদলায় না। কিন্তু এই নাম কিভাবে পাওয়া যাবে? মিশরের পুরনো লেখা কিভাবে পড়া হয়েছিলো দেখা যাক।

মিশরের পুরনো লেখা অনেক আগে খুঁজে পেলেও অনেকদিন পর্যন্ত সে লেখা কেউ পড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ অন্য

জায়গায় এমন একটা পাথর কুড়িয়ে পাওয়া গেলো, যাতে একই কথা একই সঙ্গে গ্রীক আর মিশরীয় লিপিতে লেখা আছে। তখন তা থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে মিশরের পুরনো লেখায় 'টলেমি' নামটা বার করা গেলো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একই কথা যদি দুটো ভাষায় লেখা থাকে একমাত্র তাহলেই অজানা লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব। এই উপায় না থাকার জন্যেই পৃথিবীর অনেক পুরনো লিপির আজও পাঠোদ্ধার করা যায়নি। যেমন, ক্রীট্ কিংবা সিন্ধু উপত্যকার লিপি।

॥ হরফের আগে ॥

ক্রীট্-এর সব থেকে পুরনো লিপি প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার। তাতে ছবির সাহায্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পরের দিকের এক ধরনের লিপি পাওয়া যায়—তাতে সোজা কিংবা বাঁকা দাগ দিয়ে লেখা হয়েছে। সোজা আর বাঁকা দাগগুলো দিয়ে যে নানা রকমের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

তিন থেকে চার হাজার বছর আগে এশিয়ায় হিটাইটদের বেশ দাপটই ছিলো। তাদের সঙ্গে যে আসীরীয় আর মিশরীয়দের লেনদেন ছিলো তার লিখিত প্রমাণ আছে। আসীরীয়দের কাছ থেকে তারা কোণাচে লেখার ধরন শিখেছিলো; তাদের নিজেদের লেখা বলতে ছিলো ছবি এঁকে ভাব প্রকাশ করা। ঐ ধরনের লেখা শুধু তারা স্মৃতিস্তম্ভের জন্যে পাথরে কিংবা ধাতুর

ওপর লিখতো, কিন্তু আটপৌরে লেখা হিসেবে তারা কোণাচে ধাঁচের আসীরীয় লিপিই ব্যবহার করতো।

॥ কোণাচে লেখা ॥

হরফ হবার আগে মধ্য প্রাচ্যের বেশির ভাগ লিপির মধ্যেই পাওয়া যায় খুন্তির মতো কোণাচে ধাঁচের লেখা। এই ধাঁচটা আদতে এসেছিলো সুমেরীয়দের কাছ থেকে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরীয়দের মধ্যে লেখার এই ধরনটা ছিলো। তারও আগে দুটো ধরনে লেখা হতো (১) পাথরের ওপর খোদাই করা চিত্রলিপি ; (২) মাটির ওপর বাঁকা-সোজা দাগ কেটে লেখা। মাটির ওপর দাগ কেটে ছবি আঁকা শক্ত ; তাতে সময়ও লাগে অনেক। তাই লেখার মধ্যে ছবির ভাব কমে আসতে লাগলো।

পরে মাটির ফলকে লেখা হলেও লেখার ধাঁচ গেলো খুন্তির মতো বদলে। কোণাচে ধরনের লেখা হতে লাগলো। তা থেকে ছবির ভাব বাদ গিয়ে সেগুলো ক্রমে শব্দের চিহ্ন হয়ে উঠলো। তাতে আরও সুবিধে হলো এই যে সহজে এবং তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হলো। আজ যেমন কাগজে লেখা হয় তেমনি সেযুগে মাটির ওপরই লেখা হতো। লেখার জন্যে এক রকমের খাগের কলম ব্যবহার করা হতে লাগলো। লেখায় সেই জন্যেই কোণাচে ভাব ফুটে উঠলো। মাটির ওপর বাঁকা দাগ কাটা মুশকিল, তাই শুধু সোজা লাইনেই লেখাহতে লাগলো। মাটির ওপর এই লেখার নকল করে পরে পাথরের ওপরও কোণাচে ধাঁচের লেখা দেখা দিলো।
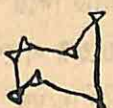
কিন্তু লেখায় ছবির ভাব যে একেবারে উঠে গেলো তা নয়। শব্দগুলোর মানে বেঁধে দেবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে ছবি জুড়ে দেওয়া হতে লাগলো। যেমন মৃত বোঝাবার জন্যে অনেক সময় আমরা নামের আগে একটা ছবি বা চিহ্ন জুড়ে দিই—'পিতার নাম ৺বটকৃষ্ণ নন্দী।' পড়বার সময় এই চিহ্ন উচ্চারণ করবার দরকার হয় না, যেমন পড়বার সময় আমরা কমা কিংবা দাঁড়ি উচ্চারণ করি না। সুমেরীয়দের লেখায় এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হতো দেবতা, মানুষ, দেশ, শহর, নদী, গাছ এবং পাহাড়ের নামের সঙ্গে। কেননা আমি যদি লিখি সরস্বতী—তাহলে তা দেবীর নামও হতে পারে, নদীর নামও হতে পারে আবার কোনো মেয়ের নামও হতে পারে। যাতে বুঝতে ভুল না হয় তারই জন্যে চিহ্ন দেওয়া।

১ নং চিহ্ন হলো দেবতার, ২ নং লেখাটি দিয়ে 'অ' শব্দ বোঝানো হচ্ছে ; ৩ নং লেখাটি দিয়ে 'সুর' শব্দ বোঝানো হচ্ছে। ৪ নং লেখায় দেবতাসূচক চিহ্নের পাশে আসীরীয় ধাচে 'অসুর' শব্দ লেখা হয়েছে। আসীরীয়দের কাছে 'অসুর' মানে কিন্তু 'দেবতা'।

॥ মিশ্র শব্দ ॥

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে চীনদেশে লেখার আবিষ্কার হয়েছিলো। হাড়ের ওপর লেখার সব থেকে পুরনো যে নমুনা পাওয়া গেছে, সেটা অবশ্য অতোদিন আগেকার নয়। এই সব লেখা থেকে মনে হয়, অন্যান্য লিপির মতোই চীন-দেশেও একই পথে লেখার বিকাশ হচ্ছিলো। ছবির জায়গায় ক্রমেই আওয়াজ এসে জুড়ে বসছিলো।

কিন্তু চীনা ভাষাটাই এমন যে তাতে নানা ধরনের আওয়াজ দিয়ে বেশিসংখ্যক শব্দ তৈরি করা যায় না। ফলে, একই রকমের শব্দের একাধিক মানে থাকে। কাজেই ভিন্ন রকমের অর্থ বোঝাতে

গেলে শব্দের সঙ্গে আলাদা আলাদা চিহ্ন জুড়ে দেবার দরকার হয় আওয়াজের সঙ্গে এই ধরনের চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় মিশ্র শব্দ। চীনা ভাষায় শতকরা নব্বই ভাগই হলো এই ধরনের মিশ্র শব্দ।

যেমন 'ফ্যাং' একটা শব্দ। কিন্তু তার সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন জুড়লে উচ্চারণ ঠিকই থাকবে, কিন্তু মানে একদম বদলে যাবে। 'ফ্যাং' মানে 'চৌকো'। তার সঙ্গে মাটির চিহ্ন জুড়লেই 'ফ্যাং' মানে হয়ে যাবে 'রাস্তা'। তেমনি 'ফ্যাং' শব্দটার আগে 'কথার' চিহ্ন দিলে তার মানে হবে 'খোঁজখবর নেওয়া'। আবার 'স্ত্রী'র চিহ্ন 'ফ্যাং'-এর আগে জুড়লে তার মানে হবে 'বাধা দেওয়া'। চিহ্নগুলো বোবা, কিন্তু শব্দটা সরব। কাজেই 'ফ্যাং' বললে বোঝা মুশকিল। লিখলে তবেই মানেটা পরিষ্কার হবে।

চীনা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ অনেক বদলে গেছে। কিন্তু লেখার দিক থেকে চেহারা একই আছে। যেমন বাংলায় লেখা হয় 'এক'—কিন্তু তার উচ্চারণ কেউ করে 'য়েক', কেউ করে 'অ্যাক'।

ফলে, উত্তর আর দক্ষিণ চীনের লোক যদি পরস্পরের মধ্যে কথা বলে, কেউ কারো কথা বুঝবে না। কিন্তু একজন যদি লেখে, তাহলে অন্যের তা বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

।। মিশরীয় চিত্রাক্ষর ।।

মিশরীয় লেখার সব থেকে পুরনো যে নমুনা পাওয়া যায়, তা লেখা হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় ছ হাজার বছর আগে। প্রথমে ছিলো নিছক ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া। স্মৃতিস্তম্ভ, কবর এবং ঘরবাড়ি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল রাখার জন্যে এবং ধর্মাচরণের

জন্যে পাথর কিংবা কাঠের ওপর খোদাই করে লেখা হতো। কলম আর কালি দিয়ে কাগজের ওপরও কখনও কখনও লেখা হতো। কাগজ তৈরি হতো প্যাপিরাস্ গাছের পাতা থেকে।

আটপৌরে লেখায় ধরে ধরে সুন্দর করে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। কাজেই লেখার ছাঁদ ক্রমেই বদলে সহজ হতে লাগলো। ২৪ পৃষ্ঠায় মাছের ছবি মিশরীয় রীতিতে কিভাবে পরে সহজে সাটে লেখা হতে লাগলো তার নমুনা দেখতে পাবে।

ছবির সঙ্গে ক্রমে শব্দ জোড়া হতে লাগলো ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিহ্ন দিয়ে এককেটি ব্যঞ্জনবর্ণ ফুটিয়ে তোলা হলো। এই রকমের চব্বিশটা চিহ্ন তৈরি হয়েছিলো। মিশরীয়দের হাতে হরফ তৈরির এই মালমসলা মজুত থাকা সত্ত্বেও তারা ছবি, শব্দ আর পৃথক বর্ণের ব্যবহার একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলো।

হরফকে ইংরেজীতে বলে 'আল্‌ফাবেট'। কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। গ্রীক ভাষায় প্রথম দু অক্ষরের নাম 'আল্‌ফা' আর 'বেটা'। কিন্তু এই নাম দুটো তাদের নিজেদের নয়। গ্রীকরা সেমাইটদের কাছ থেকে নাম দুটো পেয়েছে। সেমাইটদের প্রথম দু অক্ষরের নাম 'আলেফ' আর 'বেথ্'।

গ্রীকরা ফিনিসীয়দের মারফত সেমাইটদের কাছ থেকেই হরফ লিখতে শিখেছিলো। সেমাইটরাই পৃথিবীতে সকলের আগে শুধু-মাত্র বর্ণের সঙ্গে বর্ণ জুড়ে লিখতে শিখেছিলো। চিহ্নের সঙ্গে ছবির সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সে জায়গায় তারা এনে বসিয়েছিলো নিছক শব্দের আওয়াজ। এক হিসেবে আজকের সমস্ত লেখাই তাদের কাছে ঋণী।

সেমাইটদের হরফে একটা অসুবিধে ছিলো এই যে তাদের কোনো স্বরবর্ণ ছিলো না। কাজেই গ্রীকরা সেমাইটদের কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ বানিয়ে ফেললো। এইভাবে এলো 'এ', 'ই', 'আই', 'ও', 'ইউ'।

সেমাইটদের লেখার ধরন প্রাচীন ভারতবর্ষও গ্রহণ করেছিলো—তাই থেকে এসেছে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি। ব্রাহ্মী লিপি থেকেই এসেছে আজকের দেবনাগরী হরফ। সেমাইটদের প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'অ' যোগ করে ভারতীয় লিপিতে মুশকিলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলো। 'প্' হলো 'প', 'ব্' হলো 'ব'। আ-কারাদি অন্যান্য স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

বিভিন্ন অক্ষরলিপি কিভাবে একটা থেকে আরেকটা এসেছে পরের পাতায় দেখানো হলো :

❖

মিশরীয় চিত্রাক্ষর
সিনাই হরফ
প্রাচীন সেমিটিক (কল্পিত)
উত্তর সেমিটিক
দক্ষিণ সেমিটিক
আরামাইক
ফিনিসীয়
ইথিওপিক
ব্রাহ্মী (?)
আরবী
হিব্রু
পহ্লবী
খরোষ্ঠী
গ্রীক
দেবনাগরী
এত্রুস্কান
রুন (?)
অস্কান
লাতিন
রোমান
গ্ল্যাগোলিটিক
সিরিলিক
আধুনিক রুশ

সবকিছুর গোড়ায়

ছান্দোগ্য উপনিষদে দুটো গল্প আছে। একালের ভাষায় বললে গল্প দুটো দাঁড়ায় এই :

।। নারদ আর সনৎকুমার ।।

প্রথম গল্পে নারদ এসে সনৎকুমারকে ধরলেন, 'আচার্যমশাই, আমাকে শিক্ষা দিন'। সনৎকুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে বলো তোমার বিদ্যের দৌড় কতোদূর।'

নারদ একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। দেখা গেলো নেহাত কম জানেন না। বেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, কালতত্ত্ব, নক্ষত্রবিদ্যা, ধনুর্বেদ সবই তাঁর জানা। তাছাড়া তিনি জানেন সাপের বিষ ঝাড়তে, গন্ধদ্রব্য তৈরি করতে, নাচতে গাইতে বাজাতে।

শুনে সনৎকুমার বললেন, 'এসবই হলো নাম। নামের ওপর দখল থাকলে—নামের যতোদূর দৌড়, একজন ততোদূর স্বাধীন হতে পারে।'

নারদ জিজ্ঞেস করলেন, 'নামের চেয়ে বড়ো কিছু আছে কি ?'

উত্তরে সনৎকুমার বললেন, 'নিশ্চয় আছে। নামের চেয়ে বড়ো হলো ভাষা। ভাষা না হলে কিছুই জানানো যেতো না। পৃথিবী, জল, বাতাস, আকাশ, মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সত্য আর অসত্য, ভালো আর মন্দ, নানা তত্ত্ব—এসবই ভাষা দিয়ে জানানো হয়। ভাষার যতোখানি দৌড়,

একজন ততোখানি স্বাধীন হতে পারে।'

নারদ আবার জিজ্ঞেস করলেন, ভাষার চেয়ে বড়ো কিছু আছে কিনা। এইভাবে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগলো।

নারদের একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার যা বললেন, সংক্ষেপে তা হলো এই :

॥ ভাষা, অন্ন, প্রকৃতি ॥

ভাষার চেয়ে বড়ো মন। হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন আমরা আমলকী ফল ধরে থাকি, তেমনি নাম আর ভাষাকে ধরে থাকে মন। মন দিয়ে আমরা একটা বিষয় স্থির করি, তারপর সেই বিষয়টা দখলে আনি।

মনের চেয়ে বড়ো সংকল্প। প্রথমে মন সংকল্প করে, তারপর ধারণায় আনে, তারপর মুখ নাড়ে, তারপর শব্দ বার হয়।

সংকল্পের চেয়ে বড়ো চিত্ত। কেননা মানুষ আগে অনুভব করে, তারপর সংকল্প করে।

চিত্তের চেয়ে বড়ো ধ্যান।

ধ্যানের চেয়ে বড়ো বিজ্ঞান। বিশেষভাবে জানার নামই বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের চেয়ে বড়ো বল। অনেক জানে শোনে এমন একশো জন লোককে একজন শক্তিশালী লোক একাই কাঁপিয়ে তুলতে পারে। জোর থাকলে তবেই মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে, কাছে যেতে পারে, দেখতে পারে, শুনতে পারে, ধারণা করতে পারে, বুঝতে পারে, হাতেকলমে বিশেষভাবে জানতে পারে।

বলের চেয়ে অন্ন বড়ো। দশ দিন দশ রাত্তির না খেয়ে যদি কেউ বেঁচেও থাকে, তাহলেও সে দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, ধারণা করতে পারে না, বুঝতে পারে না, কাজ করতে পারে না, জানতে পারে না।

অন্নের চেয়ে বড়ো হলো জল। যদি বৃষ্টি ভালোমতো না হয় তাহলে ফসল ভালো হবে না। ভালো ফসল হবে না ভেবে দুঃখে প্রাণ কাঁদবে। আবার তেমনি ভালো বৃষ্টি হলে ভালো ফসল হবে ভেবে, প্রাণে আনন্দ হবে।

জলের চেয়ে বড়ো তেজ। বাতাসের সাহায্যে সূর্যের তেজ আকাশকে তাতিয়ে তোলে। লোকে তখন বলে, 'এতো যখন তাত, নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে।' তারপর মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায়। এসব দেখে লোকে বলে, 'এবার বৃষ্টি হবে।'

আকাশ তেজের চেয়েও বড়ো। সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি—সবই আকাশে থাকে। আকাশ মানে আবাঁধা, খোলা জায়গা। আকাশ আছে বলেই আমরা আওয়াজ করতে পারি, শুনতে পারি, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

।। স্মৃতি, আশা, প্রাণ ।।

আকাশের চেয়ে বড়ো স্মৃতি। মানুষ যদি মনে করে রাখতে না পারতো, তাহলে অনেকে এক জায়গায় জড়ো হলেও কারো কথা কারো কানে ঢুকতো না, কে কী বলছে ধরতে পারতো না, কিছু জানাই সম্ভব হতো না।

স্মৃতির চেয়ে বড়ো আশা। আশা মানুষকে উৎসাহ জোগায়,

উস্কে দেয়। যা পাইনি, তা পেতে চাই—এই চাওয়ার নামই হলো আশা। মানুষ যা কিছু জানে, যা কিছু করে—সমস্তই কিছু একটা পাবার জন্যে, অভাব ঘোচানোর জন্যে।

আশার চেয়েও বড়ো জীবন। জীবনই সবকিছুর গোড়ায়। নাম থেকে আশা পর্যন্ত যতো কিছু বলা হলো, জীবন না থাকলে তার একটাও থাকে না।

প্রথম গল্পটা এখানেই শেষ হলো। এ থেকে নারদ কী শিখেছিলেন জানি না। এর মধ্যে যে শিক্ষাটুকু আছে তা এই : মানুষের সমস্ত রকম সৃষ্টির গোড়ায় আছে জীবন। বেঁচে আছি বলেই আমরা অভাব বোধ করি, যা পাইনি তা চাই। পাবার জন্যে গতর নাড়াই, কাজ করি। করতে গেলে বিশেষভাবে জানতে হয়। লেগে থাকলে তবেই জানা যায়। যেটা জানছি সেটা কথা বলে জানাই।

॥ দলছুট দাল্‌ভ ॥

দ্বিতীয় গল্পটা যার সম্বন্ধে তার নাম বক। তার বাবার নাম দল্‌ভ। বকের আরও একটা নাম আছে। সে নামটা থেকে বোঝা যায় লোকটা দলছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গল্পটা এমন এক সময়ের যখন দলছাড়া হয়ে কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভবই নয়। বাঁচতে গেলেই দল বাঁধতে হবে। নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় কিনা দেখার জন্যেই সে বেরিয়েছিলো।

এমন সময় একদল মানুষ তার চোখে পড়লো। তাদের যে সর্দার, তার গায়ে শাদা চিহ্ন। সেই দলটা নিজেদের কুকুরের

বংশধর বলে মনে করে। কুকুর নামে পরিচয় দেয়। শুধু দলের নয়, তাদের প্রত্যেকটি লোকের নামই হলো কুকুর।

দল্‌ভের ছেলে বক শুনতে পেলো লোকগুলো তাদের সর্দারের কাছে এসে বলছে, 'ভগবান, আমাদের অন্নের ব্যবস্থা করুন, আমরা খেতে চাই।' যে অন্ন উৎপন্ন হবে, সর্দার তার একটা ভাগ পাবে। সেই জন্যেই হয়তো সর্দারকে তারা 'ভগবান' বলেছিলো।

সর্দার তার উত্তরে বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে—তোমরা কাল ভোরবেলায় এইখানে আমার কাছে এসো।'

পরদিন কী হয় দেখবার জন্যে দল্‌ভের ছেলে বক অপেক্ষা করে থাকলো।

পরদিন সে যা দেখেছিলো তা এই :

লোকগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে হেলেদুলে যেভাবে নড়বার কথা সেইভাবে নড়তে লাগলো। তারা নিশ্চয় নাচছিলো।

কাজ করতে গেলে মানুষ যেমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে 'হুঃ' 'হুঁঃ' শব্দ করে, তেমনি শব্দ করে তারা বলতে (গাইতে) লাগলো : 'ওম্‌। আমরা ভোজন করি। ওম্‌। আমরা পান করি।'

এসব দেখে দলছুট বকের চোখ খুলেছিলো কিনা গল্পে তা বলা নেই। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি দল বেঁধে অন্ন জোগাড় করবার দৃশ্যটা দেখে সে নিশ্চয় বুঝেছিলো মানুষ একা বাঁচতে পারে না। দলের মধ্যে থাকা দরকার। এই দলটার নামই সমাজ।

সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় : খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের যে কাজ, তা থেকেই এসেছে নাচ-গান, তাল-মান-ছন্দ।

ছিরি-ছাঁদ

খাওয়াদাওয়ার কথা উঠতেই সেই নেমন্তন্নটার কথা বুঝি মনে পড়ে গেলো? বড্ড সকাল-সকাল এসে পড়েছো। চলো, ততোক্ষণ বিয়েবাড়িটা তোমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

দেখো, দেখো—মেয়েরা থালায় করে কী নিয়ে যাচ্ছে দেখো? ঠিক পাহাড়ের চুড়োর মতো দেখতে। আসলে ওটা রং-করা পিটুলি। লোকে যাকে বলে 'ছিরি'। ওর একটা ভালো নামও আছে। ভালো নাম হলো 'শ্রী'। ছিদামের ভালো নাম যেমন শ্রীদাম।

॥ ব্যবহার আর বাহার ॥

ছিরিতে শুধু শোভা হয় তাই নয়। ছিরিতে নাকি শুভ হয়। শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই সমস্ত শুভকাজেই ছিরির দরকার। ধারণাটা একালের নয়। একদম সেকেলে। যখন মানুষ তুকতাকে বিশ্বাস করতো।

শ্রীর আরেক নাম লক্ষ্মী। ছিরি কিন্তু চাল-বাটা ছাড়া কিছু নয়। সেকালে সোনাদানা নয়, টাকাকড়ি নয়, গাড়িবাড়ি নয়—চালই ছিলো লক্ষ্মী। চাল-বাটা দিয়ে ছিরি বাঁধা মানে লক্ষ্মীকে বাঁধা। ঘরে লক্ষ্মী থাকলে শ্রীও থাকে। লক্ষ্মীর মধ্যে রূপ আর গুণ সমানভাবে মিলেছে।

ছিরি বলতে তাহলে শুধু রূপ নয়—গুণ। শুধু বাহার নয়—ব্যবহার। যাকে দেখতে ভালো, তাকে যদি তারিফ করে বলো :

'কী সুন্দর দেখতে তুমি। ঠিক যেন মাকাল ফল।' তাহলে সে তোমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে ছুটে আসবে। কেননা মাকাল ফল দেখতেই সুন্দর। মানুষের ভোগে আসে না। লক্ষ্মী কিংবা কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করলে বরং লোকে খুশী হয়। শৌখীন জমিদারদের পাল্লায় পড়ে একালের কার্তিক হলেন কোঁচা-দোলানো ফুলবাবু। সেকালের আসল কার্তিক ছিলেন কিন্তু জাঁদরেল সেনাপতি। রীতিমতো কাজের লোক।

॥ সাজানো গোছানো ॥

কী রকম ধুলো উড়ছে দেখো। যে লোকটা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, তার কাজের কোনো ছিরি নেই। 'ছিরি' শুনে ভেবো না আমি রং-করা পিটুলির কথা বলছি। কাজের ছিরি নেই মানে লোকটা গোছ করে কাজ করতে পারে না।

কাজ করতে গেলেই গুছিয়ে করতে হয়। শুধু হাত-পা নাড়ালেই কাজ হয় না। হাত-পা আর মাথা একসঙ্গে খাটাতে হয়। লোকটা একদম আনাড়ি। ওর হাত-পায়ের ঠিক নেই। ঝাঁটা কিভাবে বাগিয়ে ধরতে হয় জানে না। তাই উঠোনের ধুলোগুলোকেও বাগ মানাতে পারছে না।

একটার সঙ্গে আরেকটাকে মিলিয়ে, মিশিয়ে, খাপ খাইয়ে, মানানসই করে কাজ করতে হয়। নইলে সে কাজের কোনো আদায় নেই, ফল নেই। তাই সে কাজের কোনো ছিরিও নেই।

উঠোনের এক কোণে পাঁচ ফুলের সাজি নিয়ে বসে একটি মেয়ে একমনে কী যেন করছে দেখো। ফুলের তোড়া বাঁধছে

আর মালা গাঁথছে। সাজির মধ্যে একরাশ ফুল তালগোল পাকিয়ে জড়ামড়ি করে আছে। মেয়েটা তা থেকে এককেটা করে ফুল বেছে নিয়ে পরের পর মানানসই করে এমনভাবে সাজাচ্ছে যে, তারা মিলে মিশে সুন্দর হয়ে উঠছে। একই ফুল— কিন্তু তোড়া বাঁধার সময় একভাবে, মালা গাঁথার সময় আরেকভাবে সাজানো হচ্ছে। এক লোহা থেকে যেমন ছুরি, কাঁচি, নরুন রকমারি জিনিস হয়। নাঃ, মেয়েটার দেখছি কাজের ছিরি আছে।

॥ লাবণ্য ॥

খুব ক্ষিধে পাচ্ছে বুঝি। চলো দেখে আসি রান্নার দেরি কতো।

উনুন তো নয়, যেন রাবণের চিতা। যে লোকটা রাঁধছে, শহরের সে একজন নামকরা হালুইকর। রান্নার মধ্যেও কতো কারিকুরি দেখো। আগে ঠিক করতে হবে কী রাঁধবো। নানা জিনিসে মিশেল করে তবে রাঁধা যাবে। মেশাতে হবে মাপ মতো। কোন জিনিসের কী গুণ তা জানতে হবে। আর সেইসঙ্গে চাই হালুইকরের পাকা হাত।

মাংসের ঝোলটা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখো। এসো একটু চেখে দেখা যাক। এ ছি, ছি। একদম নুন দেয়নি। ঝোলের সমস্ত স্বাদ মাটি হয়ে গেছে।

নুন হলো লবণ। লবণ থেকেই আসে লাবণ্য। নুন বেশি হলে কিংবা কম হলে স্বাদ নষ্ট হয়। তেমনি লাবণ্যের কমবেশি হলে ছিরি নষ্ট হয়।

এবার এসো তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।

উঠোনের একধারে পিঁড়ির ওপর বসে আছে বর। সেকালে কিন্তু যে বিয়ে করতো তাকে বর বলতো না। যে কনে দেখে পছন্দ করতো, তাকেই বলতো বর। 'বর' মানে হলো ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা,—বেছে নেওয়া, আলাদা করা।

॥ অর্ধেক আয়না ॥

আচ্ছা, এবার বরের মুখের দিকে তাকাও তো! মনে মনে বরের মুখটাকে নাক-বরাবর দুভাগ করে নাও। এবার মুখের ডান পাশের সঙ্গে মুখের বাঁ পাশটা মিলিয়ে দেখো। হুবহু এক

রকমের নয়? আয়নায় যেমন উল্টো ছাপ পড়ে, বাঁদিকটা ডান দিক হয়ে যায়, ডানদিকটা বাঁদিক হয়ে যায়—তেমনি মুখের একটা পাশ যেন অন্য পাশটার আয়না হিসেবে কাজ করছে। শুধু মুখ

নয়, মানুষের গোটা শরীরটাকেই এইভাবে দুটো সমান ভাগে ভাগ করা যায়।

একটা কাগজে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষের একটা ছবি আঁকো। তারপর ছবিটা কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। এবার কাটা ছবিটা মাঝখান থেকে সোজাসুজি ভাঁজ করো। দেখবে ঠিক ভাঁজে ভাঁজে মিলে যাচ্ছে।

মানুষের শরীরে এই সামঞ্জস্য যদি না থাকতো, কী রকম দেখাতো বলো তো? একটা চোখ যদি অন্য চোখের মতো না হতো? দুটো কানের মধ্যে একটা যদি হতো কুলোর মতো? একদম ছিরি থাকতো না। শুধু কি তাই? কবিদের উপমা অনুসারে কারো নাক যদি সত্যিই বাঁশির মতো হতো, তাহলে কী তাকে সুন্দর দেখাতো? মোটেই না। তাছাড়া ট্রামে-বাসে ভিড়ের মধ্যে অতো বড়ো নাক নিয়ে কী বিপদে পড়তে হতো ভাবো তো।

॥ ছাঁদনাতলা ॥

পিঁড়ির ওপর যেখানে টোপর মাথায় দিয়ে বর বসে আছে, সে জায়গাটাকে কী বলে জানো? ছাঁদনাতলা। ছাঁদনাতলার ভালো নাম ছন্দস্থলী। শ্রী থেকে যেমন ছিরি, ছন্দ থেকে তেমনি ছাঁদ। শ্রী-ছন্দ মিলে হয় ছিরি-ছাঁদ।

যা আচ্ছাদন করে, ঢেকে দেয়, আড়াল করে দেয়—তাকেই

বলে ছন্দ। ছাঁদনাতলায় ছন্দ কোন্‌টা? বরের মাথার ওপর চাঁদোয়া টাঙানো হয়, যাতে দিনের তাপ আর রাতের হিম না লাগে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই সেই চাঁদোয়াটাই হলো ছন্দ। মাথার ওপরটা খোলা না রেখে ছাদ দিয়ে, ছাঁদ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, খাপছাড়াভাবে আছে —তাকে বাঁধছে ছন্দ। চাঁদোয়ার তলায় থাকে থালার ওপর রং-করা পিটুলির ছিরি। ছিরিকে ঘিরে থাকে ছাঁদ।

॥ ছন্দের নাড়া ॥

ছাঁদনাতলায় যে ব্যাপারটা হয় তাকে বলে ছাঁদনি-নাড়া। ছন্দের শক্তিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলা হয়। ছন্দের নাড়া বাঁধা মানে মঙ্গলসূত্র বাঁধা।

তাহলে ছিরি যেমন, তেমনি ছন্দ জিনিসটাও মঙ্গলের জন্যে। কাজ আদায়ের জন্যেই তাহলে এতোসব ছাঁদা বাঁধাবাঁধি।

ছাঁদনাতলায় ছন্দকে কিভাবে নাড়া দিয়ে জাগানো হচ্ছে চলো দেখা যাক। ছন্দ মানে যখন ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা বোঝায়, তখন বরও নিশ্চয় ছন্দ। কেন না 'বর' মানেও ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা বোঝায়। বরের মধ্যে যে ছন্দ, তাকে প্রথমে ছড়ি দিয়ে, নিমুখ লতা দিয়ে, রাঙা সুতো দিয়ে মেপে নেওয়া হচ্ছে। তারপর বরণডালার ঘা দিয়ে, আলোর উত্তাপ দিয়ে, শব্দের ঝংকার দিয়ে সেই ঘুমন্ত ছন্দকে নাড়া দিয়ে জাগানো হচ্ছে। বরণডালায় থাকে সেই সেই জিনিস, যা বাঁচবার জন্যে দরকার। সাত পাক দিয়ে তবে হয় বরণ। সাত পাক

কেন? বৈদিক ছন্দ সাতটি। সেই সাত ছন্দ দিয়ে নতুন ছন্দ আনা হচ্ছে। এ যেন পিদিমের আলো থেকে পিদিম জ্বালানো। যেমন প্রাণ থেকেই আসে প্রাণ, তেমনি ছন্দ থেকেই আসছে নতুন ছন্দ। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বর-বধূর হাতে হাত বাঁধা হচ্ছে। গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে।

॥ ছন্দ আর চন্দন ॥

কনের কপালে শাদা শাদা কিসের চিহ্ন বলো তো? চন্দনের ফোঁটা। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বিয়ের সাজে তাকে সাজানো হয়েছে। চন্দনের গন্ধটাও ভালো, দেখায়ও ভালো। আবার ফোড়া হলেও অনেকে ছোটো ছেলেদের গায়ে চন্দন মাখায়। 'চন্দ' থেকেই এসেছে চন্দন। ছন্দ কথাটার মূলেও আছে 'চন্দ' অর্থাৎ আনন্দ দেওয়া। যা আনন্দ দেয় তা চন্দ্র, চন্দন, ছন্দ। যা কাজে লাগে তা আনন্দও দেয়। কাজের মধ্যেই তাহলে আনন্দ। চোখে কাজল দিলে দেখায়ও ভালো; চোখও তাতে ভালো থাকে। চামড়া আর নখের শোভা বাড়ায় আলতা; তাতে চামড়া আর নখ ফাটে না।

আদিমকালেও মানুষ এমনিভাবে গায়ে রং মাখতো। রঙের অন্য নাম বর্ণ। 'বর' থেকেই এসেছে বর্ণ। সূর্যের তাত যাতে না লাগে কিংবা পোকামাকড় যাতে বসতে না পারে, তারই জন্যে সেযুগে মানুষ রং দিয়ে গায়ের চামড়া ঢেকে রাখতো। বর্ণ বলতে ছাইভস্ম, কাদামাটি, গাছগাছড়ার রস কিংবা জন্তুজানোয়ারের চর্বিও বোঝাতো। এসব আবার চিহ্ন হিসেবেও ব্যবহার হতো।

সিঁদুর যেমন এয়োতির চিহ্ন।

যা ছিলো এককালে নেহাত ব্যবহারের জিনিস, ক্রমে তা কেমনভাবে নিছক বাহারে জিনিস হয়ে দাঁড়ায় মেয়েদের হাতে হাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কনের হাতে দেখো সোনার কাঁকন। শুধু কাঁকন হাতে নয়, পায়ে পরেছে রুপোর মল। যাকে বলে কিঙ্কিণী।

॥ গহনা-বাজনা ॥

আদিমকালে কিন্তু হাত-পায়ের এই গহনাগুলো রীতিমতো কাজে লাগতো। শব্দের তালে তালে পা ফেলার সুবিধে হতো। তাই বলে আদ্যিকালে কেউ সোনার গহনা পরতো না। তখন ছিলো লোহা কিংবা অন্য কোনো ধাতুর গহনা। তারও আগে ছিলো হাড়ের কিংবা কড়ির থলি। হাত-পা নাড়লেই খুট-খাট ঠুং-ঠাং শব্দ হতো। শব্দের তালে তালে হাঁটা-চলা করার, কাজ করার সুবিধে। নাচতে গেলে ঘুঙুর লাগে। আবার দূরের গাঁ থেকে শহরবন্দরে চিঠির থলি নিয়ে ছুটে যায় যে রানার, তারও একটা ঝুমঝুমির দরকার হয়। পুরাণে ঘণ্টাকর্ণের গল্প পাওয়া যায়। ঘণ্টা যে কানের সঙ্গে লাগানো থাকতো, তা হয়তো ঠিক না হতেও পারে। কানে যাতে ঘণ্টার শব্দ পৌঁছোয়, সেই-ভাবেই হয়তো ঘণ্টা বাঁধা থাকতো। গোরু-ছাগলের গলায় যেমন ঘণ্টা বাঁধা থাকে। তাতে চলবারও সুবিধে, চেনবারও সুবিধে। গহনা জিনিসটা এককালে ছন্দের কাজ করতো। মেয়েদের হাতের শাঁখা আর লোহা হয়তো আজও সেই স্মৃতিটাই বহন

করছে। গহনা শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও পরতো।

এমন সময়—

কে এসেছে কে এসেছে

ডেকে ওঠে ময়না।

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ

মানুষ তো নয়, গয়না॥

গজেন্দ্রগমনে এক জমিদার-গিন্নি আসছেন দেখো। আপাদ-মস্তক সোনার গহনা। উনি গহনা গায়ে দিয়েছেন, না গহনার মোট বয়ে বেড়াচ্ছেন বোঝা মুশকিল। আসলে জমিদার-মশাই গিন্নিকে দিয়ে নিজের বিজ্ঞাপনের কাজটা করিয়ে নিচ্ছেন। জমিদার-মশাই তাঁর গিন্নির গায়ে গহনা ঝুলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অগাধ পয়সা। অথবা টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে না রেখে গিন্নির গায়ে নগদ সোনাদানা হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন। এটাও একটা মান্ধাতা আমলের পুরনো প্রথা।

যে হাত কোনো কাজ করে না, সে হাতে চুড়িগুলো বেসুরো হয়ে বাজে। চুড়ি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য আনে না, বোঝা/হয়ে ওঠে, টাকার গরম দেখায়—সেখানে তা হয়ে দাঁড়ায় হাতপায়ের ডাণ্ডাবেড়ি, নিছক লোক-দেখানো ঢং!

যাকে আমরা চলিত কথায় বলি 'ভড়ং'। কিন্তু এককালে এই ভড়ং ছিলো কাজের জিনিস—'ভড়ং' ছিলো সেকালের এক রকমের যুদ্ধ-যন্ত্র। কিন্তু যেই তার দরকার ফুরিয়ে গেলো, অমনি সেটা হয়ে দাঁড়ালো বাজে জিনিস। একদম ভড়ং।

গহনার ভালো নাম অলঙ্কার। 'অলম্ করে', তাই অলঙ্কার।

অলম্ কথাটার দুটো মানে পাওয়া যায়। 'অলম্'-এর একটি অর্থ 'প্রয়োজন মেটানো', অন্য অর্থ 'প্রয়োজন না থাকা'। গোড়ায় হয়তো শুধু প্রথম অর্থটাই ছিলো। পরের অর্থটা পরে এসেছে। 'আভরণ' কথাটার মধ্যেও এমনি মানে বদলাবার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সম্পূর্ণ করে ভরিয়ে তোলে বলেই সেটা আভরণ। কিন্তু 'আভরণ' জিনিসটা যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে—তখন সেটা বাড়তি, নিরর্থক, ফাল্‌তু।

॥ কাজ ফুরোলে ॥

চলতি কথায় আমরা বলে থাকি : 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী', কথাটা খুবই সত্যি। যেটা কাজে লাগে, তারই আদর থাকে। দরকার থাকলে তবেই কোনো জিনিসের দর থাকে। যেটার দর আছে সেটাই সুন্দর। দর মানে চাহিদা। চাইলে তবেই দর হয়। যেটা চাই সেটাই সুন্দর। চাই বলেই সুন্দর।

কী বললে ? শুনতে পাওনি ? এতো হৈ চৈ হচ্ছে যে এখানে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলার উপায় নেই। তাহলেও দেখো, সবাই কী খুশি। ভিড় আর হট্টগোলের জন্যেই বিয়েবাড়িটা সুন্দর জমে উঠেছে। কিন্তু বিয়ে চুকে যাবার পরও যদি এ-বাড়িটায় এ রকম ভিড় আর হট্টগোল চলতে থাকে ? তাহলে এ-বাড়ির লোকেরা ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসবে। কেননা তখন তারা চাইবে নিরিবিলিতে থাকতে।

ওকি ! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে। এক্ষুনি বোধ হয় জোর বৃষ্টি নামবে। তা হলেই তো চিত্তির। ছাঁদনাতলা ভেসে গিয়ে

বিয়েটাই না ভেস্তে যায়। কিন্তু যাই বলো—বৃষ্টিটা হলে চাষীরা বাঁচবে। নইলে খরা লেগে ধানগাছগুলো যে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এখন বৃষ্টি হলে বিয়েবাড়ির লোকদের কাছে খুবই খারাপ লাগবে, কিন্তু গাঁয়ের লোক দুহাত তুলে নাচবে। একই জিনিস স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভালো কিংবা মন্দ, সুন্দর কিংবা অসুন্দর হয়।

॥ বস্তুর মধ্যে থাকে ॥

একদল লোক আছে, যারা বলে সৌন্দর্য হলো আলাদা ব্যাপার, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোনো জিনিসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। সৌন্দর্যের একটা ধরা-বাঁধা মন-গড়া মাপকাঠি আছে তাদের কাছে। সবকিছুকে তারা সেই মাপটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুন্দর করে নিতে চায়। তাদের কাছে মাপটাই সৌন্দর্য।

লোকগুলো ঠিক যেন গ্রীক পুরাণের সেই ডাকাতের মতো যার মাপ-করা একটা টেবিল ছিলো। লোক ধরে এনে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে যদি দেখা যেতো লোকটা টেবিলের মাপের চেয়ে বেঁটে, তাহলে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা করা হতো; যদি দেখা যেতো, তার ঠ্যাং লম্বা হয়ে যাচ্ছে—তাহলে কুড়ুল দিয়ে বাড়তি অংশটা কেটে ফেলা হতো।
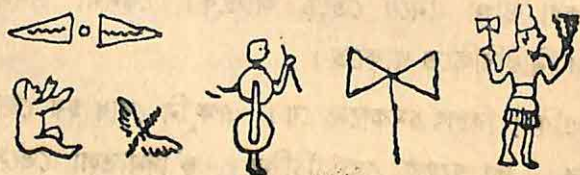
বস্তু বাদ দিলে সৌন্দর্য থাকে না। একটা সুন্দর মাটির পুতুল যদি ভেঙে যায়, কোথায় থাকবে তার সৌন্দর্য? বস্তুর মধ্যেই থাকে ছিরিছাঁদ। বস্তুর ভাবই হলো রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ। মাটির সরাটা যদি হাত থেকে পড়ে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার গোলাকার রূপটা আর থাকে না। পাথরের বাটি পাথর দিয়েই তৈরি হয়। সোনার পাথরের বাটি হয় না। তেমনি কাঁঠালের আমসত্ত্ব হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। যে দুধ খায়নি, সে দুধের স্বাদ কেমন করে বুঝবে? দুধের স্বাদ কখনই ঘোলে পাওয়া যায় না। ঢোলক না থাকলে ঢোলক বাজানো যায় কি? তোমার হাতে ঢোলক দিয়ে কেউ যদি এস্রাজের সুর শুনতে চায় তাহলে তাকে তুমি নিশ্চয় পাগল ভাববে। ফুল না থাকলে ফুলের গন্ধ থাকে কি? পচা ডিমে কেউ ফুলের গন্ধ খোঁজে না। চেয়ার থেকে তুলোর গদিটা তুলে ফেললে তখনও কি নরম ঠেকে? তুলোর বালিশে যে আরাম সেই আরাম পাবার জন্যে কেউ কি কাঠের তক্তা মাথায় দেয়?

॥ দর, আদর, সুন্দর ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে বস্তু হলেই হয় না। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে লাগ-সই বস্তু হওয়া দরকার। ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার সেখানে তেমনটি হতে হবে।

দর কথাটা যেখান থেকে এসেছে, তার গোড়াকার অর্থ হলো ফুটো করা, বিঁধ করা, খোঁড়া। হরিণ মারতে গেলে বাণ দিয়ে বেঁধা দরকার, গোরু বাঁধবার খোঁটা দরকার, উঠোনে চাষ

করতে গেলে খোস্তা দরকার। কেন দরকার? বাঁচবার জন্যে। হরিণ, গোরু, ধান—মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলেই তাদের এতো আদর।

হরিণের ভালো নাম মৃগ। মৃগ বলতে শুধু হরিণ নয়, শিকারযোগ্য যে কোনো পশুই বোঝায়। যে দিক দিয়ে গেলে শিকার মেলে, সেইটাই হলো মার্গ বা পথ। শিকারে যাবার আগে মেতে উঠতে হবে, তাই চাই মৃদঙ্গ, মর্দল বা মাদল। মৃগকে বয়ে আনে, মারতে সাহায্য করে, তাই বাতাস মৃগবাহন বা মরুৎ। মারবার পর চঞ্চল পশু হলো শান্ত, মৃত। তারপর মার্জিত করে তাকে খাওয়ার যোগ্য করা হলো। লক্ষ্য, উপায়, আবেগ, উপলব্ধি, রুচি—সমস্তই বাঁচবার জন্যে 'মর' অর্থাৎ মারবার কাজটা থেকেই এসেছে।

দরকারে লেগেছিলো বলেই হরিণ এতো সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছিলো মানুষের কাছে। শুধু যে হরিণই সুন্দর হলো তাই নয়। হরণ করার সঙ্গে যা কিছু জড়িত ছিলো তাই হয়ে উঠলো সুন্দর। যেখানে হরিণ নিজেকে ঢেকে রাখতো, তা হলো হরিৎ। বুকের মধ্যেকার ধুকপুকুনিটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এতো কাণ্ড, হৃৎ, হৃদয় অর্থাৎ প্রাণের জন্যেই হরণ। হরণের কাজটাই হলো হর্ষ। 'হর' কথাটার মধ্যে 'সমূহ' অর্থাৎ, সকলে মিলে দল বাঁধার ভাবটাও যেন লুকিয়ে আছে। একা একা বাঁচা নয়, দল বেঁধে বাঁচা। 'হর'ই বোধ হয় চাষবাসের যুগে 'হল' হয়ে দাঁড়ালো। যা ছিলো 'হরিণ', যা ছিলো সবুজ, পরে তাই কি 'হলুদ' হয়ে গেলো? পাকা ধানের ছড়া তো হলুদ রঙেরই? 'হৃৎ' হলো

'হ্লাদ'? দল বাঁধার দরুনই কি 'হল্লা'? 'হর'ই কি পরে 'হল' এবং তারপরে 'কল' হয়েছে? তাই থেকেই কি দেবতাদের আর পালপার্বণের নাম হলো—হর, হরি, হারীতী, হোলি, কালী?

॥ নতুন দরকারে ॥

দরকার ফুরিয়ে গেছে—তবু হরিণের ছবি, হরিণের গল্প ভালো লাগে কেন? তার মানে এ নয় যে, বাঁচতে গেলে আজও আমাদের শিকার করা দরকার। হরিণ এখন কামনার প্রতীক। হরিণের মাংস খেয়ে বাঁচবার কথা আমরা ভাবিই না। তবু হরিণ দেখে বাঁচবার ইচ্ছেটা বেড়ে যায়। যে অভাব আজ আমাদের আছে সেই অভাবটা তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়। আর সেই সঙ্গে মানুষকে ঠেলে দেয় নতুন ধরনের সামাজিক কাজে। সবুজ রং, পাকা ফসল হয়েছে জীবনের প্রতীক। পুরনো জিনিস প্রতীক হয়ে নতুন দরকারে লাগছে। আজ নতুন দরকারে লাগছে হরিণ নয়, হরিণের ভাব।

সুন্দর আর মঙ্গল যেন এপিঠ আর ওপিঠ। একটি আরেকটিকে ধরে আছে। যারা তালকানা, তারা শুধু একটা দিকই দেখতে পায়। কেউ দেখে শুধু সুন্দর, কেউ দেখে শুধু মঙ্গল। একটা দিক যখন তারা দেখে, তখন অন্য দিকটা দেখতে পায় না—ভাবে অন্য দিকটা নেই।

॥ আগা আর গোড়া ॥

একটা বীজ থেকে যখন অঙ্কুর বেরোয়, তখন তার আগা

আর গোড়ার মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মূল জিনিসটা যখন চোখের আড়ালে চলে যায়, তখন ওপরকার গাছ আর ডালপালাটাই চোখে পড়ে। কিন্তু মাটির নিচে থেকে গাছের শেকড় রস জোগাড় করে বলেই গাছটা বেঁচে থাকে। নইলে গাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতো। শেকড়ের জোরেই ডালপালাগুলো বাড়তে পারে, গাছে ফল ধরে। কিন্তু তাই বলে ওপরকার ডালপালাগুলোও চুপচাপ বসে থাকে না। সূর্যের তেজ থেকে, হাওয়া থেকে খাবার জোগাড় করে শেকড়ে পৌঁছে দেয়, গোড়া শক্ত করে।

গাছের এই আগার দিকটায় থাকে শিল্প আর সাহিত্য, গোড়ায় থাকে মানুষের জীবন আর সমাজ।

খেতে যাবার ডাক পড়েছে। তোমার অতো তাড়া কিসের? একটু পরেই না হয় যাবে। এমন তো নয় যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছো। সবটা না শুনলে শেষটায় আধ-কপালে হবে।

এতোক্ষণ যা বললাম চট করে দু-চার কথায় একবার ধরিয়ে দিই।

ছিরি-ছাঁদ জিনিসটা আকাশ থেকে পড়েনি। এসেছে সমাজের দরকারে। মানুষই তৈরি করেছে এই ছিরি-ছাঁদ। শ্রীর মধ্যে আছে সুন্দর আর মঙ্গল, বাহার আর ব্যবহার। ছন্দের দরুনই আসছে শ্রী। ছন্দ হলো কাজ। কাজ থেকেই আসছে সৌন্দর্য আর মঙ্গল।

॥ কাজ করা ॥

যেটা মানুষের তৈরি, সেটাই হয় শিল্প। একমাত্র মানুষই হতে পারে শিল্পী। প্রকৃতির অনেক কিছুর মধ্যেই সুর আছে, সামঞ্জস্য আছে, ছবি আছে। কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে শিল্পী বলি না। কেননা ওটা হলো স্বভাব। তেমনি মৌমাছি যে চাক তৈরি করে, মাকড়সা যে জাল বোনে—তার জন্যে তাদের আমরা শিল্পী বলি না। ওটা তারা নিছক স্বভাবের তাড়নায় করে। ভেবে চিন্তে করে না। চাওয়া আর করার মধ্যে তাদের কোনো তফাত নেই।

কিন্তু মানুষ যেটা গড়ে, সেটা শুরুতেই তার মনের মধ্যে থাকে। গড়বার আগে মানুষ মনে মনে এঁচে নিতে পারে। একজন তাঁতী যখন কাপড় তৈরি করে, তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখা যাক। সুতোর গড়নটা বদলে কাপড়ের গড়নে আনতে হয়। বুনবার আগে কাপড়ের গড়নটা সে মনে মনে এঁচে নেয়। সে ঠিক করে নেয় জাল নয়, গামছা নয়—সুতো দিয়ে সে কাপড় বানাবে। কাপড় তৈরি করাটাই তার লক্ষ্য, তার উদ্দেশ্য। তারপর কাপড় তৈরি হওয়া মানে তার উদ্দেশ্যটাই সিদ্ধ হওয়া। যেটা সে চেয়েছিলো সেটা সে পেলো।

উদ্দেশ্যটা যখন একবার ঠিক হলো, তখন তার মধ্যে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে। খামখেয়ালিপনা চলবে না। কাপড় তৈরি করতে করতে তাঁতীর যদি গামছা বোনবার খেয়াল চাপে —তাহলে কাপড় হবে না, শিব গড়তে বাঁদর তৈরি হবে। কাজ করতে করতে আগাগোড়া উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখা চাই। গোটা

কাজের ধাঁচের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজের ইচ্ছেটাকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। শুধু গা লাগানো নয়, মনটাকেও লাগাতে হবে।

॥ কাজ আর ছন্দ ॥

লক্ষ্য থাকলে তবেই সেটা কাজ হয়। কিছু একটা পাবে বলেই মানুষ কাজ করে। যে কাজে ফল নেই তাকে কাজ বলে না। যে কাজ করছে, কাজের ফলটা যদি তার মনের মতো না হয়—তাহলে কাজ করাটা হয় হয়রানির সামিল। কাজের মধ্যে আনন্দ থাকে না, কাজ জিনিসটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় ঝকমারির ব্যাপার।

ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব—ছাড়া, বাঁধা, আর আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাঁদ, চাঁদোয়া। ছেড়ে বাঁধছি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের—ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য, আনন্দ—কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।

ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে, আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও

ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে! ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার।

'করা'র ব্যাপার থেকেই পরে এসেছে 'কলা'র ব্যাপার। কাজ থেকেই শিল্প। করা আর কলা, কাজ আর শিল্প যে আগে এদেশে এক চোখেই দেখা হতো—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র চৌষট্টি কলার নাম থেকেই তা বোঝা যায়। কয়েকটি নাম এখানে তুলে দিচ্ছি :

নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, কৌচুমার (সাজসজ্জা না মেরামতি?) নেপথ্য (বেশবাস), দশন-বসন-রঞ্জন (দাঁতে মিশি আর কাপড়ে রং লাগানো), গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্য তৈরি), আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, যুদ্ধবিজয়বিদ্যা, পাকবিদ্যা, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), ডালা-কুলো তৈরি, খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘর (হাত পাকানো), আকর্ষণ ক্রীড়া (কুস্তি?), বাস্তুবিদ্যা (ঘরামি) ছলিতক (ঠকানো না খেলা?), বৈনয়িকী বিদ্যা (আদব-কায়দা), পশুপক্ষী লড়ানো, পাখি পড়ানো ইত্যাদি। সমস্তই হলো কলা। ইংরেজিতে 'কালচার' বলতে যতো কিছু বোঝায়, এখানে 'কলা' বলতে ততো কিছুই বুঝিয়েছে। কাজ, তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, খেলা, শিল্প সবকিছুই।

চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হলো কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম।

॥ কাজের ছন্দ, শিল্পের ছন্দ ॥

কিন্তু কাজের ছন্দ আর শিল্পের ছন্দ এক নয়। কাজের ফলটা পাওয়া যায় হাতে হাতে। কাজের ফলটা হলো বাস্তব। কাজ করে সোজাসুজি বাস্তবকে বদলানো যায়। কিন্তু শিল্পের ফল হলো আবেগ-অনুভূতি। মনটাকে নাড়া দেওয়া, মনে দোলা দেওয়া, মনটাকে কাজের দিকে ঠেলে পাঠানোই হলো শিল্পের কাজ। তারই জন্যে ছন্দের দরকার। ছন্দ ছাড়া শিল্প হয় না। যাতে ছন্দ নেই, তা হয় ধন্ধ-মারা, নয়তো ছন্নছাড়া।

ছন্দের একটা দিক চোখে দেখে অনুভব করার ; অন্য দিকটা কানে শুনে অনুভব করার। তার মানে এ নয় যে, ছবি দেখে শুধু চোখই খুশি হয়। চোখে যেটা দেখি, তার মধ্যে নিছক সামঞ্জস্য থাকে না। থাকে প্রাণ। ছবি জিনিসটা শুধু মাপ-জোকের ব্যাপার নয়। তা যদি হতো, তাহলে প্রতিমার বদলে কাঠামোটা নিয়েই আমরা খুশি হতাম। জীবনের ধারণা না দিলে ছবি হয় না। ছবিতে বাঁধা পড়ে স্থান। কিন্তু সেই স্থানটার মধ্যে গতির ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার মধ্যে রস থাকা চাই। 'রস' মানেই হলো গতি।

॥ চোখ আর কান ॥

ঘড়িতে ঠিক বাঁধা নিয়মে টিক্ টিক্ শব্দ হয়। তালে তালে, নির্ভুল আওয়াজ হলেও তাকে আমরা সুর বলি না। তালের সঙ্গে প্রাণের যোগ থাকলে তখনই সেটা হয় সুর। তখন সেটা দাঁড়িয়ে একঘেয়ে তাল-ঠোকা নয়—তালে তালে চলা। চললে

তাতে রস থাকে।

প্রাণ যার মধ্যে আছে, তাকে রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে শ্রবণে আমরা ধরতে পারি। ধড় বাদ দিয়ে যেমন প্রাণ থাকতে পারে না, তেমনি পদার্থ বাদ দিয়ে গতি, বস্তু বাদ দিয়ে ভাব থাকতে পারে না।

যখন আমরা কানে সুর শুনি, তখন যে আমরা একদম কানা হয়ে থাকি তা নয়। সুরের টানে ছবিও এসে হাজির হয়। একটা সুর শুনে চোখে-দেখার কতো স্মৃতি, কতো আশা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আবার যখন ছবি দেখি, তখন যে আমরা একদম কালা হয়ে যাই তা নয়। ছবির টানে সুর এসে হাজির হয়। কোনো একটা ছবি দেখে সুরের ঝঙ্কার-তোলা কতো স্মৃতি, কতো আশা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে।

জীবন বাদ দিলে ছন্দ হয়ে যায় নিছক ঠাট। জীবন মানে একা বাঁচা নয়, একসঙ্গে মিলে বাঁচা। অন্য সব প্রাণীর বেলায় একা একা বাঁচা। মানুষের বেলায় জীবনে জীবন যোগ করা। দল বেঁধে বাঁচা। তাই, মানুষের ছন্দে শুধু জীবনের রসই থাকে না, থাকে সমাজ-বাঁধা রস। একার ছন্দ নয়, অনেকের ছন্দ।

বৈদিক সাতটি ছন্দে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ছন্দের নাম থেকেই বাঁচার আয়োজন আর সেইসঙ্গে সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে বাঁচার ভাবটা আন্দাজ করা শক্ত নয়।

বৈদিক ছন্দ আছে সাতটি : গায়ত্রী, বৃহতী, জপতী, উষ্ণিক, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্‌, অনুষ্টুপ্‌। এই নামগুলোর পেছনে উৎপাদন-সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের বাঁচা-সংক্রান্ত কোনো না কোনো সামা-

জিক কাজ না থেকে পারে না। এর কোনোটাই হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি।

কী বললে? ভুঁইফোঁড় নয়? কোনো কোনোটা কিন্তু ভুঁইফোঁড় হতেও পারে। যেমন, ধরো 'বৃহতী' এক রকমের শস্য। গাছপালামাত্রই তো ভুঁইফোঁড়। ক্ষেতের আল হলো 'পঙ্‌ক্তি'। 'উষ্ণিক' কি উড়কি ধান, না রবিফসল'। 'ত্রিষ্টুপ' কি ধান-কাটা? 'জগতী' মানে তো গোরু। 'গায়ত্রী' তো প্রাণ বাঁচাবার উপায়। 'অনুষ্টুপ' এসেছে সকলের পরে। অনুষ্টুপকে বলা যায় সেকালকার 'তরুণতম'—অর্থাৎ 'আধুনিক'।

॥ আধুনিক ॥

আধুনিক হলে গোঁড়া লোকে গোড়ায় বাধা দেয়, দুর্নাম করে। তাই 'অনুষ্টুপ' ছন্দেরও সেই মুশকিল দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু বৈদিক যুগের পর 'অনুষ্টুপ' ছন্দটাই খুব বেশি রকম চলতে লাগলো। ব্যাপার দেখে একদল লোক রটাতে লাগলো প্রজা-পতির পা থেকে অনুষ্টুপ ছন্দ, ঘোড়া আর শূদ্র হয়েছে। ঘোড়া যেমন মোট বয়, শূদ্রকেও তেমনি মোট বওয়ার কাজ করতে হয়। এইভাবে ঘুরিয়ে অনুষ্টুপকে মুটেমজুর বলে উপহাস করা হলো। এই ধরনের পৌরাণিক গল্প যতো গাঁজাখুরি বলেই মনে হোক্ না কেন, গাদগুলো গলিয়ে নিলে এ থেকে পাওয়া যাবে ইতিহাসের অনেক সোনাদানা।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ বোধহয় তখনই এসেছে, যখন এক সমাজ গিয়ে আরেক সমাজ জন্ম নিচ্ছে। নতুন সমাজে এসেছে নতুন

সামগান। তার নাম 'বৈরাজ'। এ থেকেই বোঝা যায় আগেকার সেই শ্রেণীহীন সমাজ আর নেই। সমাজ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে—বীর আর বৈর। যুদ্ধে যারা জিতেছে, তারা একদলে; যারা হেরেছে তারা একদলে। এই শেষের দলটাই হলো শূদ্রদের দল। কাজের ধারা বদলে গেছে। গতি বদলে গেছে। তার সঙ্গে তাল রেখে তৈরি হয়েছে নতুন ছন্দ।

সেদিন যেমন একদল গোঁড়া লোক অনুষ্টুপ্ ছন্দকে 'কুলিমজুর' বলে ঠাট্টা করেছিলো, আজও তেমনি একদল গোঁড়া লোক ঠিক একই ভাষায় নতুন জীবনের ছন্দকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দকে যেমন সেদিন ঠেকানো যায়নি, তেমনি আজও নতুন যুগের ছন্দকে ঠেকানো যাবে না।

॥ এগিয়ে চলো ॥

নাঃ, তোমাকে বড্ডো দেরি করিয়ে দিলাম। ছন্দের পালা শেষ করে চলো এবার আসনে বসা যাক। ভয় নেই, বাড়ি ফেরার সময় তোমাকে বড়ো একটা ছাঁদা বেঁধে দেবো।

কিন্তু উঠোন পার হবো কেমন করে বলো তো? মনে মনে ভাবা যাক উঠোন পার হয়ে গিয়ে আসনের ওপর বসেছি। আসনে বসাটা হলো আমাদের অভিপ্রায়, আমাদের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ ছন্দ।

উঁহু, আসন তো মিললো না, উদ্দেশ্যটা তো হাসিল হলো না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অভিপ্রায় থেকেও ছন্দ হচ্ছে না। শুধু উদ্দেশ্যটা ছন্দ নয়।

আসনে পৌঁছতে গেলে উঠোনে পা দিতে হবে। আচ্ছা, পা রাখলাম মাটিতে। মাটিতে পা বাঁধছি—বেঁধে দেওয়াই হলো ছন্দ। কিন্তু কই? আসন তো মিলছে না। তাহলে শুধু উদ্দেশ্য আর বাঁধন থাকলেই ছন্দ হয় না।

শুধু মাটিতে পা রাখলেই চলবে না, পা ছাড়িয়ে নিতে হবে। ছেড়ে বাঁধলে তবেই হবে ছন্দ। একবার ছাড়া, আর একবার বাঁধা। বেশ, তাই করছি। কিন্তু কই? যেখানে ছিলাম, সেখানেই তো দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছি।

ওকি! তুমি অতো চটে উঠলে কেন? তুমি ভাবছো, আমার ক্ষিধে পায়নি? শুধু শুধু ছন্দ নিয়ে খেলা করছি? আহা, দাঁড়াও না আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

একেই বলে টান। উদ্দেশ্যটা যদি দায় না হয়ে তাতে প্রাণের টান থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকা অসম্ভব। তখন যেতেই হবে। আর যাওয়াটা হবে তখন আনন্দের। তখনই হবে পুরোপুরি ছন্দ।

লক্ষ্যের দিকে সানন্দে এগিয়ে যাবার নামই ছন্দ।

চলো যেতে যেতে রোহিতের গল্পটা বলি :

অনেক দিন আগে একদল লোক ছিলো। তাদের পেশা ছিলো পশুপালন করা। রোহিতাশ্ব ছিলো এমনি একটি দলের লোক। তার বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র। রোহিতাশ্ব মানে লাল ঘোড়া। হরি মানেও ঘোড়া। গোটা দলটাই বোধহয় ঘোড়া বলে নিজেদের পরিচয় দিতো।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র রোহিতকে বার বার এই বলে উপদেশ

দিয়েছিলেন :

কাজের মধ্যেই আছে মঙ্গল, কাজের মধ্যেই সৌন্দর্য। যে কাজ করে, সেই শ্রেষ্ঠ। কাজের মধ্যেই আছে সুখ। সুতরাং কাজ করো, কাজ করো। যে কাজ করে, তার দেহমন দুই-ই বাড়ে। শ্রমই সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেয়। সুতরাং, কাজ করো, কাজ করো। কাজ করলেই মধু মিলবে, মিষ্টি তুল্‌তুলে ফল মিলবে। দেখো, সূর্যের আলো চলতে চলতে কখনও ঘুমোয় না। সুতরাং, কাজ করো, কাজ করো।

ইন্দ্র কিন্তু গোড়াতেই বলেছিলেন—কাজের এই মাহাত্ম্যটা তাঁর শোনা কথা। তা থেকে মনে হয়, ইন্দ্র নিজে খাটতেন না। খুব সম্ভব ইন্দ্র ছিলেন সেকালকার একজন দাসপ্রভু। নিজে খেটে নয়, দাসদের খাটিয়েই তিনি অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন। অনেকদিন থেকেই তিনি রোহিতাশ্বকে পাবার জন্যে আড়কাঠি হয়ে লেগেছিলেন। চা-বাগানের কুলি আর লড়াইয়ের পল্টন জোগাড় করার জন্যে যেমন আড়কাঠিরা নানা রকমের মিঠে বুলি আওড়ায়—এও বোধহয় তাই।

ইন্দ্র বলেছিলেন : চরৈবেতি, চরৈবেতি—কাজ করো, কাজ করো। কিন্তু যে কাজ করবে, সে তার কাজের ফলটা পুরোপুরি পাবে কিনা—সে বিষয়ে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। আসলে কাজের ফল তারা পেলে ইন্দ্রের অতো বড়ো প্রাসাদ উঠতো না।

ভালো কথা হলেও, কথাটা কার স্বার্থে বলা হচ্ছে, সেটা দেখা দরকার। আজ যখন একদল লোক নিজেরা আরামের

মধ্যে থেকে দেশের বাদবাকি লোকদের ঘাড় ভাঙার জন্যে দেয়ালে দেয়ালে ফতোয়া টাঙাচ্ছে : "আরাম হারাম হ্যায়"—তখন সেটা আর সত্যি থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় জাল। তার মধ্যে ছাঁদ নেই, আছে ফাঁদ।

শুধু পরগাছাদের যেটা পছন্দ, সেটা ছন্দ নয়। যারা খেটে খায়, তাদের যেটা পছন্দ, সেটাই ছন্দ।

যারা শুধু ছন্দের কারিকুরিটাই ছন্দ বলে মনে করে তাদের ঠাট্টা করে ছড়া কেটে বলা যায় :

বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে।
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে॥

❖

নকল থেকে নাচ

বাড়িতে কান্নাকাটি হৈ-চৈ। একদিনের জ্বরে ছেলেটা মারা গেছে।

সেই ডামাডোলের মধ্যে দুয়োরে এক জাদু-পটুয়া এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, মরা ছেলেটার ছবি এঁকে এনেছে। ছেলেটাকে ও চিনতো নাকি? চেনা দূরে থাক, ছেলেটাকে সে জন্মেও দেখেনি। তাহলে? জাদু-পটুয়ার হাত ভালো। এঁকেছে মন থেকে।

দেখাই যাক কী এঁকেছে সে। হ্যাঁ, মানুষেরই মুখ বটে— তবে ছেলেটার মুখের সঙ্গে কোনোই আদল আসে না।

আর তাও নিখুঁত মুখ হলেও বা কথা ছিলো। এ কী একেছে জাদু-পটুয়া? নাক, কান, মুখ আছে—কিন্তু চোখ কোথায় গেলো? চোখের মাথা খেয়ে এ কী ছবি এঁকেছে সে!

জাদু-পটুয়াকে তুমি যতোটা তালকানা ভাবছো, মোটেই সে ততোটা তালকানা নয়। আসলে সে ইচ্ছে করেই চোখদুটো আঁকেনি।

চোখ না থাকায় মরা ছেলেটা পরলোকে বেঘোরে ঘুরে মরছে। ছবি এঁকে সেই খবরটাই জাদু-পটুয়া গেরস্থকে দিতে এসেছে। তাহলে এখন উপায়? উপায় জাদু-পটুয়ারই হাতে আছে। সে যদি ছবিতে চোখ বসিয়ে দেয়, তাহলেই পরলোকে ছেলেটার চোখ ফুটবে।

কিন্তু আঁকো বললেই তো আর সে আঁকবে না। তাকে

নগদ দক্ষিণা দিতে হবে। তবেই সে আঁকবে।

তুমি ভাবছো-—মরা ছেলেটার চোখ না ফুটিয়ে আগে ওরা নিজেদের চোখ ফোটাক। কেননা চোখ থেকেও ওরা অন্ধ। নইলে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারে ওরা বিশ্বাস করে ?

॥ জাত্বঘরে জন্ম ॥

কথাটা ঠিকই। কিন্তু মানুষের ইতিহাস যদি একটু খোঁজ করো, দেখবে যে জিনিসটা আজ মানুষের চোখ বেঁধে রেখেছে, এক সময় সেই জিনিসটাই মানুষের চোখ খুলে দিয়েছিলো। সেই জিনিসটা কী ? জাত্ব।

আত্তিকালের মানুষের কাছে গোটা ত্বনিয়াটাই ছিলো তখন একটা প্রকাণ্ড জাত্বঘর। জাত্বঘর বলতেই আজ আমাদের মনে হয় যেখানে আছে মরা জিনিসের কঙ্কাল। পুরোনো জিনিসপত্র। অনেক দিন আগে যার আয়ু ফুরিয়ে গেছে। যা ফৌত হয়ে গেছে।

কিন্তু এককালে জাত্ব বলতে বোঝাতো মরা নয়, জ্যান্ত। প্রাণ হারানো নয়, প্রাণ দেওয়া। পুরনো ঝরঝরে নয়, নতুন ঝকঝকে স্বষ্টি। চোখ বোঁজা নয়, চোখ খোলা।

আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো। কড় কড় কড়াৎ। মেঘের আওয়াজটাই হলো বাজ। তারপর ঝেঁকে বৃষ্টি। আগে বাজ, পরে বৃষ্টি। বার বার দেখে দেখে আদিম মানুষের মনে কার্যকারণের স্থত্রে ব্যাপারটা গাঁথা হয়ে গেলো। বাজ আর বৃষ্টির মধ্যে মানুষ খুজে পেলো মিল। কান টানলে যেমন মাথা

আসে, তেমনি বাজ ধরলেই বৃষ্টি। বাজ ধরবার ফাঁদ হলো বাজনা। আর তার কায়দাটাই হলো বাজি কিংবা জাদু।

আজ আমরা সমস্ত ব্যাপারটাই বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। কেননা আমরা জেনেছি আওয়াজ নকল করে বৃষ্টি আনা সম্ভবই নয়।

কিন্তু মেঘ থেকেই যে বৃষ্টি আসছে—এটা আন্দাজ করা সে যুগের পক্ষে কম কথা নয়। দুটো আলাদা জিনিসের মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া—সে যুগে এটা যে কতো বড়ো একটা আবিষ্কার, আজ তা আমরা ভাবতেই পারি না। আর শুধু যে জানা, তা নয়—সেই সঙ্গে সেই নিয়মটাকে হাতেকলমে কাজে লাগানোর চেষ্টা। প্রকৃতিকে শুধু জানা নয়, তাকে বদলানো। প্রকৃতিকে বদলাতে গিয়ে নিজেকে বদলানো। এক কথায়, ঠেকে শেখা।

আদিমকালে নকল করে প্রকৃতিকে দখলে আনার চেষ্টার নামই ছিলো জাদু। এই নকল করা, জাল করার ব্যাপারটাই ছিলো ইন্দ্রজাল।

মানুষের সেই আদিম জাদুঘরে বাজি, নকল, মজা, তামাসা, জাল, মায়া—এর কোনোটারই মানে বাজে, মিথ্যে, ভুয়ো ছিলো না। হাত জোড় করে চাওয়া নয়, যেটা চাইছি সেটা পাবার জন্যে হাত লাগানো। কামনাকে ক্রিয়াকর্মে ফুটিয়ে তোলা, গতরটাকে নাড়ানো। এরই নাম ছিলো জাদু।

গতর নাড়ানো মানেই গতর নাচানো। হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। কাজ করা। ফৌত হওয়া নয়। বাঁচা। থেমে থাকা

নয়। চলা।

নড়া মানেই যেন নাচা। কাজের মধ্যে নাচের ছন্দটা মানুষের চোখ এড়ায়নি। ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় তার অজস্র নমুনা। যেমন :

জোলা নাচে জুলনী নাচে
নাচে জোলার নাল।
সব চরকি উঠে বলে
আমরা নাচবো কাল ॥

সে এক আলাদা জাতুঘর। সেই আজব জাতুঘরটার হাড়ির খবর পাবে 'জানবার কথা'র দশম খণ্ডে। জাতুঘরেই জন্ম নিয়েছিলো নাচ, গান, ছবি, ছড়া, ধর্ম আর বিজ্ঞান।

॥ ব্রত আর যজ্ঞ ॥

ব্রত আর যজ্ঞই ছিলো সেই আদিম কালের জাতুঘর। কামনার সঙ্গে ক্রিয়াকর্মকে জুড়ে ব্রত আর যজ্ঞ গড়ে উঠেছিলো। শুধু চাওয়া নয়, পাবার জন্যে রীতিমতো চেষ্টা করা। চাওয়াটা একার নয়। সকলের। একা একা চেষ্টা নয়। সকলে মিলে চেষ্টা।

সমাজে তখন ভাগাভাগি হয়নি। যা কিছুই হোক—হতো সকলের জন্যে আর সকলের চেষ্টায়। সবাই খাটবো, সবাই খাবো। খাবার জোটানো ছিলো খুব শক্ত কাজ। সবাই কাঁধ না লাগালে বাঁচবার মতো খাবার জুটতো না।

আজ আমরা যে অর্থে নাচ বুঝি, সে সময় সে অর্থে নাচ

ছিলো না। সমাজে যাদেরই খাটবার মুরোদ আছে, তারাই এসে নাচে যোগ দিতো। শিকার করা, লড়াই করা, গোরু চরানো, ফসল ফলানো যেমন সমাজের সকলের কাজ, তেমনি নাচ-গানও ছিলো সামাজিক কাজ, সত্যিকারের বারোয়ারি ব্যাপার। একদল নাচবে, আরেকদল দেখবে—এরকম নর্তক আর দর্শকের ভাগ ছিলো না।

ব্রত আর যজ্ঞে গোড়ায় আদৌ পুরুত-যজমানেরও ভাগাভাগি ছিলো না। কেননা ব্রত আর যজ্ঞ বলতে তখন মোটেই পুজো-আর্চা বোঝাতো না। ব্রত আর যজ্ঞের জায়গায় জড়ো হয়ে কোনো একটা বিশেষ কামনাকে ক্রিয়াকর্মে নাচ-গানের ভেতর ফুটিয়ে তোলা হতো। ঠাকুর-দেবতা, ভজন-পূজন তখন ছিলো না। উপসর্গের মতো ওসব পরে এসে জুটেছে।

॥ আসলের নকল ॥

নাচা মানেই হলো শরীরের ভঙ্গি দিয়ে কোনো না কোনো ভাব ফুটিয়ে তোলা। হাতে তীরধনুক নেই। তা হলেও শুধু হাতে তীরধনুক ছোঁড়ার ভাবটা নকল করতে পারি। নকল করে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

নকল করার দরকার হলো কেন? যা ঘটেছে তা মনে রাখার জন্যে। স্মৃতিটাকে শানিয়ে নেবার জন্যে।

আর কোনো দরকার নেই? আছে। যা ঘটেনি, তা ঘটাতে চাই। অতীত স্মৃতির খুঁট ধরে আসে ভবিষ্যতের নতুন আশা।

আদিম মানুষেরা দল বেঁধে গেলো শিকার করতে। শখ

করে নয়, বাঁচার তাগিদে। সারাদিন এ-বন সে-বন ঘুরেও শিকার মিললো না। দুদিন পর এক মস্ত শিকার পাওয়া গেলো। শিকার নিয়ে ফিরে এসে গোটা দলটা আগুনের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে ফুর্তিতে নাচলো। তারা নকল করতে লাগলো কিভাবে দল বেঁধে এক পাল হরিণকে তাড়া করে ঘায়েল করেছে। তখন তারা সত্যিকারের শিকারী নয়, নকল শিকারী। হরিণও তো চাই। তার জন্যে তাদেরই মধ্যে কেউ মাথায় শিং লাগিয়ে সাজলো নকল হরিণ।

কিন্তু জায়গা ছোট্ট। সময় কম। তাছাড়া একেবারে আগা থেকে গোড়া পুরো ব্যাপারটা নকল করলে দুনো খাটুনি। তাতে ফুর্তিটা মাঠে মারা যাবে। কাজেই ঝাড়াই বাছাই করে সংক্ষেপে নকল করতে হবে। হুবহু নকল নয়— যা নইলে নয়, শুধু সেইটুকুর নকল। শিকার করতে গিয়ে যেসব দোষ-ত্রুটি ঘটেছিলো, নকল করতে গিয়ে তা রাখা চলবে না। ভুলগুলো শুধরে নিতে হবে।

॥ সেকালের কথা ॥

এইভাবে যেটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেটাই হবে শিকারের নাচ। শুধু একবার নয় বারবার শিকারে গিয়ে ফিরে এসে বার বার নকল করার ভেতর দিয়ে তৈরি হবে নিখুঁত শিকারের নাচ। সেই নাচই হয়ে উঠবে নতুন শিকারের মহড়া। ফিরে এসে নয়, শিকারে যাবার আগেই গোটা দল একবার নেচে নেবে। নাচের ভেতর দিয়ে দলের সবাই হয়ে উঠবে একমন, একপ্রাণ।

শিকারের আবেগ দিয়ে গোটা দলটাকে তারা টান-টান করে বেঁধে নেবে। তারপর যেমনভাবে ধনুকের ছিলা থেকে তীর ছুটে যায়, তেমনি তারা ছুটে বেরিয়ে পড়বে শিকারের অব্যর্থ সন্ধানে।

গোড়ায় থাকছে নকল, পরে আসছে নক্সা। বাস্তবের ভিত্তির ওপর দাঁড়াচ্ছে কল্পনা। আগে ছিলো ছাপ, তা থেকে নতুনের ছাঁচ তৈরি হচ্ছে। শিকারী হচ্ছে নর্তক। জন্তুর বদলে আসছে মুখোশ।

এমনি করে সেদিনের নাচঘরই হয়ে উঠলো সেদিনকার জাদুঘর। নাচ আর জাদুর মধ্যে কোনো তফাত নেই।

দেবতারা সবাই মানুষেরই ছাঁচে ঢালা। যাঁকে আমরা নাড়ুগোপাল বলে জানি, সেই কেষ্ট ঠাকুরও কম বড়ো নাচিয়ে ছিলেন না। আর শিবঠাকুরের কথাই নেই। তিনি তো নটরাজ।

॥ চাষবাসের যুগে ॥

চাষবাসের যুগে নানাদিক দিয়ে মানুষ খানিকটা থিতিয়ে বসলো। নতুন সমাজে নাচের ধাঁচও গেলো বদলে। শিকারের বদলে, জন্তুজানোয়ারের বদলে বড়ো হয়ে উঠলো ফসলের নাচ। দেখা দিলো পালপার্বণ। সমাজে একদল বাকি সকলের ফসলে ভাগ বসাতে লাগলো। জাদু আর জাদু রইলো না। মন্ত্রগুপ্তির ভেতর দিয়ে ক্রমে তা ধর্ম হয়ে উঠলো। পুরুত-বামুন আর পুজো-আর্চার পত্তন হলো। প্রকৃতি আর মানুষের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়ালো দেবদেবী। যেটা ছিলো ক্রিয়াকর্ম, সেটা হয়ে উঠলো শুকনো আচার। আস্তে আস্তে কামনা জিনিসটা-

কেও সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চললো। প্রকৃতির নিয়মটাকে নিয়তি হিসেবে খাড়া করা হলো। তার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। যারা ফলের অধিকারী, তারা বাকি সবাইকে বললো— কাজ করে যাও, কিন্তু ফলের আশা কোরো না।

সে যুগে যে দলের সর্দার, সে নাচেরও সর্দার ছিলো।

আমাদের দেশে বৈদিক আমলেও ছিলো নাচের খুব কদর। মহাব্রত আর অশ্বমেধ যজ্ঞে রীতিমতো নাচ হতো। শুধু যে ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব আর কিন্নরীরা নাচতো তাই নয়, ইন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন সেরা নাচিয়ে।

পুরনো যুগে নাচ বলতেই বোঝাতো জাদুর নাচ। কাজেই দলের সর্দার, নাটের গুরু আর জাদুকর হতো একই লোক। যেমন, ইন্দ্র।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ব্যাপারটা হঠাৎ রাতারাতি ঘটেছে। এ-দল আর ও-দলের মধ্যে কোথাও খোলাখুলিভাবে কোথাও বা ভেতরে ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে সমানে লড়াই চলেছে। তাই দেবদেবীহীন পুরুতশূন্য ব্রত আজও এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে টিঁকে আছে। বাইরের দিকে রং লাগিয়ে ভেতরটা বদলানো যায়নি।

ওপরতলার মানুষেরা হাতের কাজকে হেয় করে সমাজে এনেছে জাতের বালাই। কাজের সঙ্গে নাচের নিকট সম্পর্ক। নাচও তাই তাদের কাছে হয়েছে ছোটোলোকের ব্যাপার। নট সম্প্রদায়কে তারা সমাজের একদম নিচু তলায় ঠেলে পাঠিয়েছে।

নাট বলতে বোঝায় নাচ। কিন্তু নাটা বলতে আজ আমরা বুঝি খাটো, বেঁটে, অপটু। নাটা কথাটাকে খাটো করার ব্যাপার ওপরতলার লোকদের চক্রান্তেই ঘটেছে কিনা কে জানে? সত্র বা ছত্র থেকেই কি ছত্রিশ কথাটা এসেছে? ছত্রিশ জাত বলতেই হীন বোঝায়। বামুন ছাড়া সমাজের বাকি সবাই হলো ছত্রিশ জাত। অর্থাৎ, বামুনরা সমাজের মাথায় বসে বাকি সবাইকে বলতে লাগলো ইতর জন।

॥ হুকুম নয়, সাধনা ॥

আগে গাঁসুদ্ধ লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে নাচ-গান করে নিজেদের কামনাকে হাতেকলমে ফুটিয়ে তুলতো। নাচ-গানের ব্যাপারটা শখশৌখিনতা ছিলো না। আমরা এক—সকলের মধ্যে এই বোধটাকে নাচের ভেতর দিয়ে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলা হতো। ফসল বোনার আগে, ফসল কাটার আগে সকলে মিলে নাচতো। আলাদা আলাদা কাজগুলোকে পরের পর একসঙ্গে গুছিয়ে নেওয়া হতো। সেপাই-পল্টনদের চাঁদমারি আর কুচকাওয়াজের মতো নাচ ছিলো কাজের মহড়া।

জাতুর মধ্যে ছিলো আসলের নকল। ক্রমে আসলের চেয়ে নকলের ওপরই বেশি জোর পড়তে লাগলো। কামনার চেয়ে ক্রিয়াকর্মই হলো প্রধান। জাতুর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলো জাতুকর। দলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলো দলপতি। দশের চেয়ে বড়ো হলো এক।

যে ছিলো নাচের সর্দার, দল থেকে নিজেকে সে আলাদা

করে নিলো। দাঁড়িয়ে না থেকে সে বসে পড়ে হাতমুখ নাড়াতে লাগলো। ক্রমে সেই বসে-পড়া নাচের সর্দার হলো ঘণ্টা-নাড়ানো পুরুতঠাকুর। প্রকৃতির ওপর হুকুম খাটানোর বদলে প্রকৃতিকে তোয়াজ করার ব্যাপার এসে গেলো।

গোড়ায় হয়তো বলা হচ্ছিলো :

নেবুপাতা করঞ্চা। হে বৃষ্টি, ধরে যা ॥
পরে লোভ দেখিয়ে বলা হতে লাগলো :
আয় বৃষ্টি হেনে। ছাগল দেবো মেনে ॥

॥ ঠাঁই-নাড়া ॥

যে যুগে মেয়েরা ছিলো সমাজের পাণ্ডা, তখন জাদুর ওস্তাদরাও ছিলো মেয়ে। পরে লাঙল দিয়ে চাষ হতে লাগলো, তখন পুরুষরা হয়ে উঠলো সমাজের প্রধান। তখন থেকে 'ডাইনী' কথাটা সাংঘাতিক নিন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। অথচ ডাইনী মানে সত্যিই খারাপ নয়। জাদু, নাচ, কাজ—সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিলো দক্ষ, দক্ষিণ অর্থাৎ ডান্। কিন্তু পরের যুগে পুরুষেরা কিভাবে মেয়েদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়লো 'বামা' কথাটা থেকেই তা বোঝা যায়। মেয়েদের নাম বদলে হলো বামা। আজও পুজোপার্বণে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের ডান হাতের ব্যবহার নেই। পুরুষরা প্রধান হয়ে হয়তো মেয়েদের দক্ষতা ভাঙার জন্যেই ডান হাতটা অচল করে দিয়েছিলো। যেমন করে ইংরেজদের হাতে কাটা পড়েছিলো এদেশের তাঁতীদের বুড়ো আঙুল। যারা ছিলো, একদিন নটী, নাটুয়া—তারাই কি

পরে হলো নাটা?

ক্রমে নাচ হয়ে গেলো দেখার ব্যাপার। একদল নাচবে, বাকি সবাই দেখবে। নাচিয়ের দলটাকে আস্তে আস্তে গ্রামের বাইরে ঠেলে দেওয়া হলো। মঠমন্দিরে, পালপার্বণেও তাদের ঠাঁই থাকলো না। নট, রজক, বাজিকর, ভাট, চারণ—এরা হলো একদম নিচু জাত। নাট বা নাচ জিনিসটাকে সামাজিক কাজ থেকে ছেঁটে দিয়ে ঠাট আর ঠাট্টা করে তোলা হলো।

সমাজে নাচ দুভাগ হয়ে গেলো। একভাগ তলানি হয়ে পড়ে থাকলো নিচের তলায়। সমাজে তার কোনো কদর থাকলো না। অন্য ভাগটা উঠে গেলো দেবদেউলের উঁচু মণ্ডপে। যার নাম হলো—নাটমন্দির। নাটমন্দিরে চললো দেবদাসীদের নৃত্য। সে নাচে সাধারণ মানুষ জায়গা পেলো না। মন্দিরে ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অস্পৃশ্য সাধারণ মানুষ সে নাচ দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলো। দেবদাসীরাও সমাজের চোখে খাটো হয়ে গেলো।

পরের যুগে যখন রাজা-জমিদারের দল সমাজে প্রধান হয়ে উঠলো, নাটমন্দির খালি করে নাচ চলে গেলো রাজসভায়। দেবদেবীকে খুশি করার চেয়ে নেচেকুঁদে রাজা-জমিদারদের খুশি করার ব্যাপারটা বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। যা ছিলো গোড়ায় আসলের নকল, ক্রমে তা আসল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে হয়ে উঠলো ঢং-সর্বস্ব কালোয়াতি।

॥ মনে পড়ে ॥

সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নাচ একেবারে মুছে গেলো না।

গানবাজনার মধ্যে, ব্রতের মধ্যে, খেলার মধ্যে, পুজোপার্বণের মধ্যে বর্ণচোরা হয়ে টিঁকে থাকলো নাচ।

ব্রতের ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় অজস্র নাচুনে ছন্দ। পড়তে পড়তে মাথা না দুলিয়ে পারা যায় না। যেমন :

সাগর! সাগর! বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি ॥

রাম আসেন, লক্ষ্মণ আসেন, আর আসেন নল।
তাই দেখে থেমে থাকবেন সমুদ্রের জল ॥

ভাই গেছেন বাণিজ্যে—
ফিরে আসবেন আজ।
বাপ গেছেন বাণিজ্যে—
ফিরে আসবেন আজ ॥

বাংলায় 'লাচাড়ি' ছন্দ নাচ থেকেই যে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আজও বিয়েসাদির সময় গ্রামদেশে মেয়েরা দল বেঁধে জল সাধতে যায় আর সেই সঙ্গে গায় :

কাৎলা মেঘে হুড়ুম দুড়ুম
সিঁদ্‌রী মেঘে পানি গো।
সেই পানিতে ভেজে মোর
জননী মার ডুলি গো।

'বাঘাইর বয়াত' শুনতে শুনতে যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় একদল লোক গোল হয়ে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচছে :

আইলামার, আইলামার
আইলামার ভাই অরণে। লক্ষ্মীদেবীর চরণে ॥
লক্ষ্মীদেবী দিলাইন বর। চাইল কড়াই বাহির কর ॥
চাইল আনিয়া দিলাম কড়ি। তারে করব লড়িদড়ি ॥
লড়িদড়ি শ্যামার। সোনার মুটুক রানীর।
সোনার মুকুট, রুপার খিলা।
ঐ ঘরখান দেখতে ভালা ॥
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড়ো কাটুনি।
মাইয়া বড়ো টিটুনি ॥
কেন গো মা বিরস বদন। আমায় দিবি কত ধন ॥
আমি তো মাগিয়া খাই। বাঘাইর বয়াত গাই ॥
বাঘাই গেছে নাগাইপুর। আমার বাড়ি মথুরাপুর।
আইতে যাইতে অনেক দূর। মধ্যে একটা সমদ্দুর ॥

নাচের মধ্যে মাঝে মাঝে হৈ হৈ, হায় হায়, আহা, হ্যাদে, ভাই, রে, হে এবং এই ধরনের আরও অনেক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কাজ করার সময় মানুষ মুখে যেমন আওয়াজ করে, ওগুলো সবই তা থেকেই এসেছে।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রে মাঝিরা নৌকো ছাড়ার সময় ডাকে আলি-আলি-আলি। রাস্তায় দুরমুশ ঠুকতে ঠুকতে একদল লোক আওয়াজ করে বলে হেঁই-ও। রাখাল মাঠে গোরু চরাতে চরাতে অদ্ভুত সুর করে ডাকে উ-অ। ডাকগুলো সব সময় এক রকমের নয়। কাজের যেমন যেমন ধরন, ডাকটাও সেই হিসেবে বদলে যায়।

সাপের হিস্ হিস্ শব্দ আর সাপুড়ের মুখের আওয়াজ কিভাবে মন্ত্রের মধ্যে মিলেছে দেখো :

আল বিষ কাল বিষ পরাণ বিষ।
কাটি যায় নাশ পাশ শরীষ শরীষ ॥
হাড়বন্ধ দ্বারবন্ধ পীর্তিকার লোহবন্ধ।
জ্ঞান কাটুম কুজ্ঞান কাটুম, কাটুম সব সন্ধ ॥
যত দূরে যায় বৃক্ষ অশ্বথের ছায়া।
ততদূর জান্য ভাই বাসুদেবের মায়া ॥
ধার্মিক লোকে আজ্যে গাছটি পাপী লোকে কাটে।
হাথ ভড়ি কাটিয়া তার ফেলিল পখুরির ঘাটে ॥
এবে খেলান ভাল খেলা খেলে
পদুমা খেলা খেলে রাজার ঝিয়ে
আ আরে হা।

॥ নাচ আর খেলা ॥

নাচ আর খেলার মধ্যে খুবই মিল দেখতে পাওয়া যায়। হা-ডুডু খেলাটা দেখলেই মনে হবে লড়াইয়ের নাচ থেকে এসেছে। তেমনি গোল্লাছুট খেলার মধ্যে সেই যুগটা যেন ধরা আছে, যে যুগে মানুষের প্রধান পেশা ছিলো জন্তুজানোয়ারের রাখালি করা। গোল্লাছুট খেলার ছড়ায় তার নমুনা পাওয়া যায় :

ছি তোকে করছে কে।
ঘণ্টার আগে দাবড়াইছি ॥
ঘণ্টার আগ বইর‍্যা বাঁশ।

ফেইছা মারুম ঝাঁকে ঝাঁক ॥
আমার খেল মরে নাই রে বাক্সা বনে আছে।
তিন চার রাখালে তার পানি যোগাইতেছে ॥
আমার খেল মারিলি।
কোথায় নিয়ে গাড়িলি ॥
শিয়ালে শকুনে খায়।
গন্ধে গন্ধে পরান যায় ॥

কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন কথাও কিভাবে ঢুকে গেছে দেখো :

হরতনি ধরতনি খঞ্জনি পায়।
চৌধুরী মশাই পান খেলায় ॥
পান খেলাইতে নাগরী।
সোনাবান্ধা পাগড়ী ॥

॥ নাচ থেকে ॥

আজ যখন আমরা কবিতা পড়ি, তখন মনেই হয় না নাচ থেকেই এসেছে কবিতা। কিন্তু কবিতার ছন্দ শরীরের মধ্যেও দোলা আনে। পড়তে পড়তে কখন যে আমাদের হাত নড়তে থাকে, তালে তালে পায়ের পাতা নড়ে ওঠে খেয়ালই থাকে না।

নাচের সঙ্গে গোড়ায় ছিলো অস্পষ্ট ছাড়া-ছাড়া আওয়াজ। সেই আওয়াজ ক্রমে স্পষ্ট কথা হয়ে ফুটে উঠলো। সেই সুরেলা কথাই হলো গান। গান থেকে সুর আর কথা ক্রমে আলাদা হয়ে গেলো। সুর থেকে হলো কণ্ঠসঙ্গীত আর যন্ত্রসঙ্গীত। কথা থেকে হলো কাব্য আর নাটক।

সাধারণ মানুষ তাই বলে নাচের কথা কখনও ভোলেনি। প্র বাদ-প্রবচনের মধ্যে বার বার নাচের কথা মনে করেছে। নাচ বলতে তামাসা নয়, খেলা নয়। নাচের সঙ্গে কাজের নিকট-সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যেই আজও লোকে বলে : 'নাচের পা থামে না' 'নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ', 'নাচে ভালো পাক দেয় মন্দ'। এমনি আরও কতো কী।

নিজেরা না বলে বার বার লৌকিক দেবতাদের মুখ দিয়ে নাচের গুণগান করা হয়েছে। চণ্ডীঠাকুরকে দিয়ে বলানো হয়েছে—ধূপধুনো, মন্ত্রতন্ত্র নয় :

"নাট-গীতে করো মোর পূজার সৃজন"।

নাচের এমনি জাদু।

গানবাজনা

তুমি কি যখন-তখন যেখানে-সেখানে যা-তা সুরে গান গাও? তাহলে পুরাণের এই গল্পটা মনে রেখো।—

গানবাজনা শিখে নারদের একবার ভারি অহঙ্কার হয়েছিলো। ধরাকে সরা জ্ঞান করে তিনি বেপরোয়াভাবে বীণা বাজাতে লাগলেন।

একদিন নারদ রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন হাড়গোড়ভাঙা এক-দল লোক তালগোল পাকিয়ে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। নারদ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে, বাছা? আহা, কে তোমাদের এমন দশা করলো?'

তার উত্তরে তারা বললো, 'আমরা হলাম রাগরাগিণী। নারদ নামে এক আনাড়ি বীণা-বাজিয়ের হাতে পড়ে আমাদের এই হাল হয়েছে।' নারদ তখন নিজের ভুল বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন।

গল্পটা শুনে তুমি যদি বেজায় খুশি হয়ে ভাবো, বেসুরো গান গেয়ে অমুকের ঠ্যাং এবার ভেঙে দেবো—তাহলে সত্যি সত্যি ঠ্যাং ভাঙতে পারবে কিনা জানি না। তবে এটুকু বলা যায় যে, তাতে পাড়াপড়শীদের হাতে তোমার নিজের ঠ্যাং খোঁড়া হবার ভয় আছে।

॥ থাকা না থাকা ॥

সুরের সঙ্গে দেহের একটা যোগ আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সুর মানেই হলো শব্দকে খেলানো। তেমন জোর শব্দ হলে কানের পর্দা ছিঁড়ে না যাক, কানে যে তালা ধরতে পারে—সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয় তোমাদের আছে। না থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

সুর শুনে অনেক সময় আমাদের রোমাঞ্চ হয়। শাদামাটা করে বললে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। আবার সুর শুনে কখনও আমাদের চোখ বুঁজে আসে।

সুর জিনিসটা তাহলে নেহাত ফ্যালনা নয়। তাই বলে দীপক গাইলে আগুন জ্বলে ওঠে, মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে—এসব কিন্তু একদম বানানো গল্প। কোনো একটা সত্যি জিনিসকে ফোলালে ফাঁপালেই সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। বেশি কচলালে লেবু যেমন তেতো লাগে।

॥ পৃথিবীতে বাসা ॥

কেননা তা যদি হতো, তাহলে মাঠে গিয়ে সবাই মিলে গান গাইলেই ফসলে গোলা ভরে যেতো— কষ্ট করে বীজ বুনতে আর ধান কাটতে হতো না।

যখন আমরা বলি গানের চমৎকার মিষ্টি সুর— তখন আমরা সুরটাকে চোখে দেখে চমৎকার কিংবা চেখে দেখে মিষ্টি বলি, এমন নয়। দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, গন্ধ নেই— কিন্তু শোনা যায়। সুর আছে বলেই শোনা যায়। সুর যখন না থাকে তখন কি আমরা সুর শুনতে পাই? নাকমুখ বন্ধ করে

গলা দিয়ে সুর বার করার ক্ষমতা কারো নেই। তেমনি হারমোনিয়ামটা যখন মেঝেতে পড়ে থাকে, যখন কেউ তাতে হাত লাগায় না। তখন তা থেকে সুর বার হওয়া সম্ভবই নয়। যা থেমে থাকে, তাতে সুর নেই।

গতি না থাকলে সুর হতেই পারে না। গান কিংবা গৎ—দুইয়ের মধ্যেই আছে গতি। আর গতি বললেই বুঝতে হবে কোনো কিছুর গতি। বস্তুরই বিশেষ একটি গুণ হলো গতি। একটা বল তুমি এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে দিলে। বলটা হলো বস্তু; বলের গড়িয়ে যাওয়াটা হলো বলের গতি। কিন্তু কেউ যদি বলে, বল না থাকলেও বলের গতি থাকা সম্ভব—তাহলে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে বলা যায়, এবার একটু ছুটে এসো তো, চাঁদ।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, সুর জিনিসটা ধরা-ছোয়ার বাইরে অতীন্দ্রিয় কোনো ব্যাপার নয়—পৃথিবীতেই তার বাসা। তাই কলের গানে, তারে-বেতারে তাকে ধরা যায়।

আওয়াজকে নিয়মে বাঁধলে হয় সুর। সুরেলা কথাই হলো গান।

॥ সুরের স্রষ্টা ॥

একদিক থেকে মনে হবে, মানুষ ভারি বিনয়ী। যে গৌরব তার একার পাওনা, সেটা সে দেবতার হাতে সঁপে দেয়। বলে, মহাদেবের প্রণবধ্বনি থেকে সুরের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মহাদেব যে মানুষেরই মনগড়া, সে খবরটা লুকনো থাকে। বিশেষ

অবস্থায় নিজেকেই মানুষ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেবতা করে তুলেছে। আর মানুষের গুণগুলোই প্রকাণ্ড করে দেবতার ওপর চাপিয়েছে।

কাজেই অন্যদিকে আবার মনে হবে, মানুষ বেজায় অহঙ্কারী। যেটা তার পাওনা নয়, সেটাও সে দেবতার বেনামীতে নিজের করে নিয়েছে। সুর তো প্রকৃতি থেকেই এসেছে। যখন মানুষের জন্মও হয়নি, তখনও প্রকৃতিতে সুর ছিলো। নদীর কুলু কুলু শব্দে, পাখির গলায়, বাতাসে-কেঁপে-ওঠা গাছের পাতায় গান ছিলো। কাজেই গান গেয়ে মানুষের গুমর করবার কিছু নেই।

যে যাই বলুক, সুর কিন্তু মানুষেরই সৃষ্টি। প্রকৃতি হাজার চেষ্টা করলেও দু কলি গান গেয়ে শোনাতে পারবে না। ঝাউগাছ তার পাতায় সাঁই সাঁই আওয়াজ না করে জলের কুলুকুলু আওয়াজ তুলুক দেখি? পারবে না। মানুষ নিজের খুশিমতো সুর বানাতে পারে। দুঃখে তার এক সুর, আনন্দে তার অন্য সুর। সুরের ওপর তার দখল আছে। তাই সুকণ্ঠের জন্যে কোকিলের যতো নামই থাক, গানের আসরে কোকিলকে বসিয়ে দিলে—আসরে একটি লোকও বসে থাকবে না। কারণ, কোকিল শুধু একঘেয়ে ডেকে যাবে। কোকিল গান গায় না—ডাকে। ওটা তার স্বভাব। যেটা স্বভাব, সেটা সৃষ্টি নয়। স্বভাবকে বদলানোর নামই হলো সৃষ্টি।

মাটির নিচে ধুলোময়লার মধ্যে মিশে থাকাই লোহার স্বভাব। লোহা তৈরি করতে গেলে লোহার সেই স্বভাব বদলাতে হবে—তাকে মাটি থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। সে কাজ

শুধু মানুষই করতে পারে।

॥ কোথা থেকে এলো ॥

তেমনি প্রকৃতির মধ্যে যে সুর আছে, সেই সুর ছাড়িয়ে এনে তাকে ভেঙেচুরে মানুষ নিজের গলায় এবং যন্ত্রে বেঁধেছে।

এক সময়ে দল বেধে তালে তালে কাজ করতে গিয়েই মানুষের মুখে বুলি ফুটেছিলো। সেই বুলি থেকেই কথা আর সুরের জন্ম।

নাচের সময় যেটা ছিলো হাততালি, পরে সেটা বদলে হয়েছে বাজনা। যেটা ছিলো হৈ-হল্লা, সেটা পরে বদলে হয়েছে গান। শুধু দল বেঁধে নয়, পরে মানুষ একা একা গাইতে বাজাতে শিখেছে।

ছাড়া ছাড়া আওয়াজ কিভাবে মীড় আর মূর্ছনা হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। একদল বলেন, শোক থেকে সুরের জন্ম। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা দেখান—অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতির মানুষেরা সন্ধ্যে হলে মৃতদের জন্যে সুর করে কাঁদে। গ্রীসেও এইভাবে কাঁদবার রেওয়াজ ছিলো। আমরা যে কাঁদুনি গাওয়ার কথা বলি, তার পেছনেও এরকম ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে পুরাণে বলা হয়, শোক থেকেই নাকি শ্লোকের জন্ম। বাল্মীকি নাকি ক্রৌঞ্চমিথুনের শোক দেখে শ্লোক রচনা করেছিলেন। তবে আমাদের দেশে মেয়েরা যখন শোকে কাতর হয়ে কাঁদে, সেই কান্না দূর থেকে গানের মতোই

শোনায়। তার মধ্যে অনেক সময় কথা কম থাকে কিংবা অনেক সময় কথার ভেতর দিয়ে গাথার মতো কাহিনী বলা হয়ে থাকে।

॥ ডাক নকল ॥

ইটের তৈরি প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের পাশে মাটির তৈরি ঘর থাকলে—দেখে মনেই হয় না দুটো একই জায়গা থেকে এসেছে। অথচ দুটোই মাটির তৈরি। কাঁচা মাটি আর পোড়া মাটি। তাহলে আসলে তফাত দুটোর প্রকৃতিতে নয়। সেই প্রকৃতিকে মানুষ কতোখানি বদলেছে, তার মধ্যে কতোখানি হাত লাগিয়েছে—সেটাই হলো দেখবার ব্যাপার।

আমাদের দেশের পুঁথিপুরাণের মতে, সপ্তস্বর নাকি সাতটি জানোয়ারের ডাক থেকে এসেছে। ময়ূর থেকে সা, ষাঁড় থেকে রে, ছাগল থেকে গা, বক থেকে মা, কোকিল থেকে পা, ঘোড়া থেকে ধা, হাতি থেকে নি। পুঁথিপুরাণে জন্তুজানোয়ারের নাম নানা কারণে এসেছে। অনেক সময় জন্তুজানোয়ারের নামে মানুষ বোঝানো হয়েছে। সে যাই হোক। নাচের মধ্যে যখন মুখোস পরে জন্তুজানোয়ারের ভাবভঙ্গি নকল করা হয়েছে, তখন জন্তুজানোয়ারের ডাক নকল করা মোটেই অসম্ভব নয়।

বছর কয়েক আগে মধ্য প্রাচ্যে উর নামে একটি জায়গায় পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার তারের একটি বাজনা পাওয়া গেছে। তার মাথার দিক এবং তলার দিক ষাঁড়ের মতো করে তৈরি। তাতে লেখা আছে, এই বাজনার সুর ষাঁড়ের আওয়াজের মতো। আরও যেসব বাজনা পাওয়া গেছে, তার প্রত্যেকটাতেই কোনো

না কোনো জন্তুজানোয়ারের মূর্তি।

বাজনায় ডাক নকল করার ব্যাপারটা আজও আমাদের দেশে দেখা যায়। অনেক সময় ঢাকের গায়ে মেঘ ডাকানো, এক-তারায় কথা বলানো হয়। তাছাড়া, যারা হরবোলা তারা তো তাদের গলা দিয়েই রকমারি আওয়াজ নকল করতে পারে।

॥ সুরের জাতু ॥

সুরের সঙ্গে জাতুর আছে নাড়ীর যোগ। গানই ছিলো আগে মন্ত্র। শুধু যে সুর করে মন্ত্র বলা হতো, তাই নয়—সুরের একটুখানি এদিক-ওদিক হলে ফল নাকি উল্টো হয়ে যেতো। এ থেকে বোঝা যায়, সুর ছাড়া জাতু হতো না।

আজও আমরা সাপুড়েদের মুখে যে মন্ত্র শুনি তাও গান ছাড়া কিছু নয়। যেমন :

কুসডিডপের মাঝে আছে সুধাতরঙ্গিনী
রিনিঝিনি বএ পানি ভেটিঞা উজানি।
তার মধ্যে বাঁশঝাড়টি তিন ঠাঞি তার বাঙ্কা
ছিরকাল বৈস্থে তায় ধুকুড়িয়া কাঁখা।
ছিরকাল বৈস্থে কাগ করে সাঞি সাঞি
যা রে হরের বিষ ত্রিভুবনে নাঞি ॥
পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডুবিয়া ধরে মাছে
ডুমুনি ফুকুরে কান্দে সমুদ্রের মাঝে।
জলে নাচে জলে গায় জলে ধরে তাল
যা রে হরের বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥

কিংবা

হস্ত সারম্ গলা সারম্ আর সারম্ মুখ।
পেট পিট চরণ সারম্ আর সারম্ বুক।
পেট পিঠ চরণ সাতি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে।
কাঙরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দ রাজা বলে অমুক হৈলা অমর ॥

দলবদ্ধ নাচের গোড়া বাঁধা হয়েছিলো যেমন দলবদ্ধ কাজে, তেমনি গানেরও গোড়ায় ছিলো কাজ। মান্ধাতা আমলের যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষ প্রথম কাজে নেমেছিলো, তারই ঠুংঠাং ঠুকঠাক শব্দে মানুষের হাতে বেজে উঠেছিলো প্রথম সুর। সেই শব্দগুলোকে আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলে, নানাভাবে খেলিয়ে, মানুষ নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছে সুর।

॥ কাজের কথা ॥

শুধু গানের বাইরের দিকটা নয়, ভেতরের বলবার কথাটাও জীবন থেকেই উঠেছে। কাঠমিস্ত্রির 'ঘুণ্ ঘুণ্ ঘুণায় নমো'র মধ্যে যন্ত্র এবং মন্ত্র দুটোই ধরা পড়েছে।

বাংলার ফকির-বাউলদের গান আমরা যতোটা আধ্যাত্মিক বলে মনে করি, আসলে তা অতোটা আধ্যাত্মিক নয়। যারা গায় এবং যাদের মধ্যে গায়, তারা সবাই গ্রামের সাধারণ মানুষ। যে তত্ত্বের কথা বাউলদের মুখে শোনা যায়, তার মধ্যে ঠাকুর-দেবতার আমদানি হয়েছে পরে। এর মধ্যে এমন সব ইশারা

আছে, যা থেকে মনে হয় এক সময় এগুলো জাতব্যবসার গান ছিলো। যে বেদে-বেদেনীরা ওঝা কবিরাজি আর ঝাড়ফুঁক করতো, যে ডোম-ডুমুনীরা বেত আর চামড়ার কাজ করতো, যে মাঝি-মাঝিনীরা মাছ ধরতো আর নৌকো বাইতো—এক সময় এসব তাদেরই গান ছিলো। সাঁই, গোসাঁই, গুরু—এরা ছিলো জাদুকর-পুরুত এবং দলের সর্দার।

দেহতত্ত্বের গানে আছে বত্রিশ নাড়ী আর নানা রকম নল-নলীর কথা। আমাদের দেশে শুধু গাছগাছড়ার ওষুধ নয়, নানা রকম যন্ত্র দিয়ে অস্ত্রোপচার এবং শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে হাড়ি-ডোম-বেদের দল সিদ্ধহস্ত ছিলো। ঝাড়ফুঁক, নল চালানোর ব্যাপার তো এখনও চলে। বাংলার প্রাচীনতম চর্যাগানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যখন বাউলের গান শুনি :

কারখানা দেখে এলাম দমঘরে।
হিনলে আর মিনলে স্বকনলে আর কর্নলে
তাদের জনম পশুর মত চারজনা এক রং ধরে
চার জনা চার ধারা বয়, সাধককে তা খুজে নেয়
পুশিদার সব জানা যায় যে যেমন উড়িতে পারে॥

আগে যা ছিলো কাজের কথা, পরে তাই দিয়ে রহস্য তৈরি করা হয়েছে :

ও তুই দিন থাকতে গুরু চাঁদকে
উঠা নৌকার পর।
নইলে রৌদ্র উঠে যাবে চটে
শেষে দোহাই দিবি কার॥

ছয় বোম্বেটে আছে নেয়ে
তারা আস্তে আস্তে নেবে বেয়ে
তোরে ছেড়ে দিবে ঘোলায় নিয়ে
কেন্দে কেন্দে কূল পাবি না আর ॥

॥ যন্ত্র আর বাজনা ॥

একেবারে গোড়ার দিকে যেমন কাজের টানে গান, তেমনি বাজনাও এসেছিলো।

যে সব যন্ত্র নিয়ে আদিম যুগের মানুষ কাজ করতো, সেইসব যন্ত্রের কিছুকিছু যে চেহারা বদলে বাজনা হয়েছিলো নিচেকার ছবিগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে।
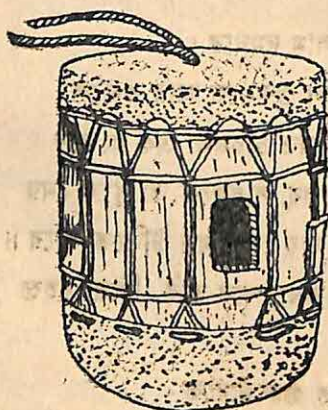
আজও পৃথিবীতে যেসব মানুষেরা আদিম অবস্থায় আছে, তাদের মধ্যে বাজনার খুব বেশি প্রচলন দেখা যায় না। যেমন, চুক্‌চিদের মধ্যে আছে শুধু একরকমের তালঠোকার যন্ত্র। কাজ করার যন্ত্র তেমন বাড়েনি বলেই বাজনার যন্ত্র এতো পিছিয়ে আছে।

বাজনা চার রকমের— তত অর্থাৎ তারে বাঁধা; বিতত বা আনদ্ধ অর্থাৎ চামড়ায় বাঁধা; ঘন অর্থাৎ কাঁসার যন্ত্র; শুষির অর্থাৎ হাওয়ার যন্ত্র।

॥ পেটা ও ঘষা ॥

বিতত এবং ঘন— এই দুরকমের যন্ত্রই সব থেকে পুরনো। ঢোল হলো বিতত, কাঁসি হলো ঘন। এই যন্ত্রগুলো ঠুকে বাজাতে হয়। আদিম কালের মানুষের হাতে প্রথম অস্ত্রই ছিলো পাথরের। পাথরে পাথর ঠুকে আগুন পেতে হতো। শুধু ঠোকা কিংবা পেটা নয়, ঘষার কাজটাও ছিলো বড়ো। পশু শিকার করে তার চামড়া দিয়ে মানুষ তাই অনেক আগেই বাজনা বানাতে শিখেছিলো।

আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে আমাদের দেশের পুরনো পুঁথিতে যেসব নাম পাওয়া যায়, তা হলো এই: পটহ বা নাগরা, মর্দল বা মাদল, হুড়ুক্ক, আকরট, অঘট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, কড়ুলি, টুক্কবি, ত্রিবলী, ডিণ্ডিম, ভূমিদুন্দুভি, ভেরী, নিঃসান, তুম্বকী, টমকী, মণ্ড, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলী, পাদবাদ্য, শর্কর, মট্ট, মৃদঙ্গ বা খোল, তবলা, ঢোলক, ঢোল, কাড়া, জগঝম্প, তাসা, দামামা, টিকারা, জোরঘাই, খোরদক। এর মধ্যে অধিকাংশই আজ লুপ্তপ্রায়।

বৈদিক যুগেই দেখা যায়, বাজনা বাজানো একটি দলের রীতি-মতো পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ে বাজনার যে খুবই আদর ছিলো, তা দেবতাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। শিবের হাতে দেখি বিষাণ, বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, সরস্বতীর হাতে বীণা, কৃষ্ণের হাতে বাঁশি।

ঘন যন্ত্রের মধ্যে পড়ে ঝাঁঝর, ঘড়ি, কাঁসি, ঘণ্টা, ঘুঙুর, নূপুর, মন্দিরা, খরতাল, করতাল, সপ্তসরাব বা জলতরঙ্গ।। এই সব যন্ত্র লোহা, কাঁসা, কাঁচ ইত্যাদি ধাতু দিয়ে তৈরি। তবে এক সময়ে বোধ হয় বেশির ভাগ ছিলো লোহার তৈরি। কেননা 'ঘন' বলতে বোঝায় লোহা।

॥টানা ও ঠোকা॥

তারের বাজনাও খুব পুরনো। তোমরা নিশ্চয় ধুনুরির হাতে তুলো ধুনবার যন্ত্র দেখেছো। তার আওয়াজটাও বাজনার আওয়াজ মনে করিয়ে দেয়। ধুনুরি কাঠের যে ডাণ্ডা দিয়ে ঘা দেয়, সেই ডাণ্ডা দেখলে এস্রাজের ছড়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গুণ-লাগানো ধনুকের মতো যে যন্ত্রটা দেখছো, ওটা এক রকমের বাজনা। কোনো কোনো আদিম জাতির মধ্যে আজও তার চলন আছে। আমাদের দেশে এরই নাম 'পিণাক'। পিণাক এবং তারপর একতারা—এই দুটোই এদেশে সবচেয়ে পুরনো বাজনা।

তারের যন্ত্র বলতে শুধু লোহা কিংবা তামার তার বোঝায় না। ধাতু তৈরির আগে থেকে জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি

হয়ে আসছে তাঁতের যন্ত্র।

আরেকটি যন্ত্র আছে, তার নাম 'আলাপিনী'— এর তার ধাতুরও নয়, তাঁতেরও নয়, তিনগাছি পাট কিংবা কার্পাস সুতো দিয়ে তৈরি।

তত যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আলাপিনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লরী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, সস্তিকা, কূর্মিকা, কুব্জা, সারেঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিস্বরী, শ্বেততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠী, ঠংসরী, ঔড়ম্বরী, পিনাক, নিবঙ্গ, পুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডহ, কপিনাম, মধুস্যন্দী, ঘনা, মহতীবীণা, রঞ্জনী, সারদ, সুরসান্দ, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, নাদেশ্বরবীণা, ভরতবীণা, তুম্বুরু বীণা, কাত্যায়ণবীণা, প্রসারণী, এস্রাজ, মায়ূরী, একতারা, গোপী-যন্ত্র, মোরঙ্গ, আনন্দলহরী। এর মধ্যে অধিকাংশ বাজনাই আজকাল আর দেখা যায় না।

এই সব যন্ত্রের জন্যে দরকার হয় জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি, ছাগলের চামড়া, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল, লাউয়ের খোলা, বাঁশ, পাট, কার্পাস, কাঠ, লোহা, পিতল।

॥ ফুঁক যন্ত্র ॥

মুখের ফুঁ দিয়ে বাজাবার যন্ত্রকে বলে শুষির যন্ত্র। এর চারটে ভাগ : বাঁশি, কাহলা, শিঙা, শঙ্খ। এই যন্ত্রের মধ্যে পড়ে বাঁশি, পার, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহলা, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, রামশৃঙ্গ, শঙ্খ, ভোড়হী, বুক্কা, স্বরনাভি, আলাপিক, চর্মবংশ, সজলবংশী, রৌশনচৌকী, সানাই, কলম, তূরী, ভেরী, গোমুখ, তুবড়ি, বেণু। এর বেশির ভাগই এখন লুপ্ত।

শিঙা এবং শাঁখ পশুশিকার এবং লড়াইয়ের কাজে ডাক দেবার জন্যে ব্যবহার হতো। খুব সম্ভবত পশুপালন ও চাষ-বাসের যুগে বাঁশির চলন হয়। শিব আর বিষ্ণুর হাতে শিঙা আর শঙ্খ এবং কৃষ্ণের হাতে বাঁশি দেখে খানিকটা তা আন্দাজ করা যায়।

নানা রকমের বাজনা দেখে বোঝা যায় এর সবগুলো একই সময়ে তৈরি হয়নি। যন্ত্রগুলো তৈরি করার আগে মানুষকে প্রকৃতির কতকগুলি নিয়মকানুন আবিষ্কার করতে হয়েছে। গোড়ায় যেমন-তেমন পাথরই ছিলো মানুষের একমাত্র অস্ত্র। তারপর পাথর ঘষেমেজে যখন ছুঁচোলো আর ধারালো হলো, তখন মানুষ দুনিয়াকে জয় করার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো। আজ পরমাণু ভাঙার যুগে সে কথা ভেবে

আমাদের হাসি পায়।

কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্বের তফাতে আওয়াজের তফাত হয়, ছাড়া ছাড়া আওয়াজকে একটানাভাবে বাঁধা যায়, একটানা আওয়াজকে নানা সুরে খেলানো যায়— এসব নিয়ম আবিষ্কার করতে যুগের পর যুগ কেটে গেছে।

আর এই সমস্ত আবিষ্কারের পেছনে আছে সেই সব সীমা-সংখ্যাহীন অক্লান্ত মানুষ যারা বাঁচার চেষ্টায় পৃথিবীকে বদলেছে। তাদেরই দৌলতে আজ আমরা আনন্দে গান গাই, বাঁশি বাজাই।

পালাবদলের পালা

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। বারোমেসে গানের দেশ।

পালপার্বণ নিয়ে কেন যে এতো মাথা ঘামানো, এমনিতে বোঝা মুশকিল। শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন, অল্পবিস্তর সব দেশেই দেখা যায় বছরে কতকগুলো বাঁধা সময় আছে, যখন দেশসুদ্ধ লোক উৎসবে মেতে ওঠে।

সময় বাঁধার ব্যাপারটা কিভাবে এলো? একেবারে বছরের গোড়া থেকে শুরু করা যাক। যে দিনটা আমাদের নববর্ষ, সেদিন কিন্তু সব দেশে নববর্ষ নয়। সব দেশের পাঁজি এক রকমের নয়। কিন্তু এখন আমাদের বৈশাখে বছর শুরু হয় বলে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, চিরদিনই আমাদের বৈশাখে বছর শুরু হয়ে এসেছে।

॥ প্রকৃতির পালা ॥

বর্ষ বলতে আমরা বুঝি বছর। এক সময় জলবৃষ্টির সময় বর্ষ শুরু হতো। তাই থেকেই ঋতুর নাম হয়েছে বর্ষা। আবার হায়ন বলতে বোঝায় বছর। আর অগ্র বলতে বোঝায় আগা। তাহলে অগ্রহায়ণেও বোধ হয় কোনো এক কালে বছর শুরু হতো। হায়ন মানে আবার ফসল। জলবৃষ্টি আর ফসল—এ থেকে মনে হয় বছর ঠিক করার সঙ্গে এ দুটো ব্যাপারের বিলক্ষণ যোগ ছিলো।

বারো মাসের তেরো পার্বণের ভেতর দিয়ে মানুষ সব চেয়ে

বেশি করে কী চায় ? জলবৃষ্টি, ফসল আর ধনদৌলত। আর চায় কোল-জোড়া মানিক। এরই জন্যে মানুষের যতো যজ্ঞ, ব্রত আর জাদু। এরই জন্যে যতো মাথা কোটা আর মানত করা।

সব দেশে একই সময় খাবার মিলবে, ফসল ফলবে—তার কোনো মানে নেই। তাই দেশে দেশে পাঁজির তফাত। এমন কি আমাদের মতো বিরাট বড়ো দেশেও পুজোপার্বণের এবং তার দিনতারিখের অমিল দেখা যায়।

নিজের নাড়ি একবার টিপে দেখো কি রকম তালে তালে চলছে। ক'দিন আগে চাঁদ দেখেছিলে, আজ দেখো, চাঁদ কতো রোগা হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও তুমি খালি গায়ে ঘামতে। আর আজ উনুনের পাশে বসে ঠাণ্ডা হাত দুটো গরম করছো। চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি, শীত আর গ্রীষ্ম কি রকম পালা করে আসে। সূর্য সকালে একদিনও উঠতে ভুল করে না।

প্রকৃতির মধ্যে এই পালা-ক্রমে আসা-যাওয়া, ওঠা আর ডোবা—এ থেকেই এসেছে সময়ের ধারণা। দিন মাস বছরের ভাগাভাগি। পালপার্বণ আর পালাগানের গোড়া রয়েছে প্রকৃতির এই পালাবদলের মধ্যে।

॥ পালপার্বণ ॥

তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় পাঁজি আছে। পাঁজির মধ্যে কী লেখা ? অমুক দিন অমুক তিথি। অমুক তিথিতে অমুক পুজো। আর সেই সঙ্গে শুভ-অশুভ, নিষেধ-বারণ, ক্রিয়াকর্মের লম্বা সব ফিরিস্তি। আজও আমাদের দেশে এমন লোকের

অভাব নেই যারা পাঁজির কথা বেদবাক্য বলে মনে করে। রওনা হবার সময় হাঁচি পড়লে তারা ঘরে ফিরে আসে, গ্রহণের সময় গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভাবে পুণ্য হলো। ধারণাগুলো হাজার হাজার বছরের পুরনো।

কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে সেকালের বিচার একদম অচল। মানুষের জয়যাত্রার পথে একদিন জাদু ছিলো অগ্রগতির বড়ো একটা ধাপ। এই জাদুযজ্ঞ থেকেই পরে হয়েছে পালপার্বণ। মানুষ তখন ঘরসংসারে ক্ষেতেখামারে থিতিয়ে বসেছে। জীবনের নতুন দরকারে প্রকৃতির পাল্‌টানে তৈরি হলো নতুন এক শিল্প—পালা, যাত্রা, নাটক।

পুরনো ব্রতগুলোই পরে চেহারা বদলে পালপার্বণে দাঁড়িয়ে গেছে। যে ব্রতগুলো আজও টিঁকে আছে, তাতে চাঁদ বেচারীর তেমন স্থান নেই। অথচ রূপকথার চাঁদবুড়ির কোলে জন্তু-জানোয়ার, হাতে চরখা। ছড়ার মধ্যে চাঁদের আদরও কম নয় :

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতী।
চোক ঢুল্ ঢুল্ নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের বাজী॥
চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ, হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ, চাঁদে মেশামেশি॥

কিন্তু ব্রতগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সূর্যকে নিয়ে আদিখ্যেতা। রায় হলেন সূর্য।

রায় উঠছেন, রায় উঠছেন, বড়োগঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে তেল-গামছা? দাও গো রেয়ের হাতে॥
রায় উঠছেন অস্রে। তামার হাঁড়ির বর্ণে॥

॥ সূর্য বড়ো ॥

চাঁদের বদলে সূর্যকে বড়ো করে দেখার ব্যাপারটা এসেছে পরে। আদিম কালের মানুষ গোড়ায় মনে করতো চাঁদের দরুনই পশু-পাখি গাছপালা মরে বাঁচে। চাঁদ ছিলো তাদের কাছে জাদু-জানা ডাইনী বুড়ি। তিথিনক্ষত্র মাসবছরের কর্তা।

কিন্তু পরে চাষবাসে হাত লাগিয়ে আস্তে আস্তে মানুষ বুঝতে পারলো আসল কর্তা চাঁদ নয়—সূর্য। সূর্য হলেন 'রায়' অর্থাৎ রাজা। এক ঋতু গিয়ে অন্য ঋতু আসার মূলে আছেন সূর্য ঠাকুর। শীতের সময় সূর্যঠাকুরের মৃত্যুদশা। তখন গাছপালা যায় শুকিয়ে, সমস্ত কিছুতে টান ধরে।

কিন্তু মানুষ হাত গুটিয়ে বসে থেকে মৃত্যুকে মেনে নেয় না। সূর্যকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে তুষতুষুলি ব্রত করে। সূর্যকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই কেন ?

কোদাল-কাটা ধন পাবো। গোহাল-আলো গোরু পাবো।
দরবার-আলো বেটা পাবো। সভা-আলো জামাই পাবো।
সেঁজ-আলো ঝি পাবো। আড়ি-মাপা সিঁদুর পাবো।
ঘর করবো নগরে। মরবো গিয়ে সাগরে।

॥ মৃত্যু থেকে জীবন ॥

তুঁষ, গোবর আর খড়কুটো একসঙ্গে মেখে আগুনে পুড়িয়ে তার-পর জলে ভাসাতে হবে। আর সেই সঙ্গে আছে ছড়া :

কুলকুলনি এয়ো রানী, মাঘমাসে শীতল পানি।
শীতল শীতল ধাই লো, বড়গঙ্গা নাই লো

শীতল শীতল জাগে, রাই বিয়ে মাগে।

আমাদের রায়ের বিয়ে ঝাম-কুর-কুর দিয়ে॥

তোষলার সরায় করে মৃত্যুর যে কুশপুত্তলিকা জলে ভাসানো হচ্ছে, সেটা আসলে সারমাটি—যা নতুন ফসল ফলাবে। মৃত্যুর মধ্যেই আছে জীবন। সূর্যের নাম করে সবটাই আসলে ফসলের ক্রিয়াকর্ম। সে যুগে মানুষ মনে করতো বীজ রোয়া মানেই হলো বীজটার মৃত্যু হওয়া—বীজটাকে মাটির নিচে কবর দেওয়া। সেই বীজ থেকে উঠবে অঙ্কুর। মৃত্যু থেকে জীবন। শীত হলো মৃত্যু, বসন্ত জীবন।

কুশপুত্তলিকায় মৃত্যুকে পুড়িয়ে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ডাক দেয়:

'উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।'

সূর্যঠাকুর কুয়াশায় চাপা পড়ে আছেন। ডাক শুনেও উঠতে পারেন না। করুণভাবে নিজের অক্ষমতা জানান:

'উঠিতে না পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।'

তখন কুয়াশা ভাঙার কাজে মানুষই হাত লাগায়।

ঠাকুর মানুষের সাহায্য নইলে বাঁচতে পারেন না। তারই জন্যে দরকার হলো মাঘমণ্ডল ব্রতের। এই ব্রতের মধ্যে কিভাবে পালাগান আর যাত্রার ভাব ফুটে উঠেছে এক নজরে দেখা যাক।

প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম দৃশ্য

(পুকুরের ঘাট। ভোরের কুয়াশায় চারদিক আঁধার। ঘাটে লাউল ঠাকুর নামিয়ে দু দল মেয়ে চোখমুখ ধুচ্ছে আর বলাবলি করছে)

১ম দল। চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?

২য় দল। ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।

নেপথ্যে। হারে, কি কি ফুলে মুখ পাখালি?

মেয়েরা। ইতল বেতল দুই ফুলে। সরুয়া মরুয়া দুই ফুলে ॥

মালি। সেই ফুলে খান কী?

মেয়েরা। নল ভেঙে জল খান।

যে জল ছোঁয় না রে কাগে আর বগে

সেই জল ছুঁই মোরা দূর্বার আগে।

(সাজি হাতে হাসতে হাসতে মালিনীর প্রবেশ)

মেয়েরা। হাসিস্ না লো, খুশিস্ না লো, তুই তো আমার সই!

মাঘমণ্ডলের বর্ত করুম, ঘাট পামু কই?

মালিনী। আছে আছে লো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট!

মেয়েরা। রাত পোহালে বামুনগো পৈতা ধোওনের ঠাট!

মালিনী। নাপিতবাড়ির ঘাট?

মেয়েরা। নাপিতগো ক্ষুর ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ধোপাবাড়ির ঘাট?

মেয়েরা। ধোপাগো কাপড় ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ভুঁইমালির ঘাট?

মেয়েরা। ভুঁইমালিগো কোদাল ধোওনের ঠাট।

মালিনী (হেসে)। মেলেনী বুড়ির ঘাট?

মেয়েরা। মেলেনী বুড়ির ফুল ধোওনের ঠাট।

(মালির প্রবেশ)

মালি। জইৎ গাছে কে, ডাল নামাইয়া দে

সূর্যিঠাকুর চাইছেন ফুল,
সাজি ভরিয়া দে।

মালিনী। আধা গাঙে ঝড়বৃষ্টি, আধা গাঙে মালি
মধ্যখানে পইড়া রইছে জৈৎফুলের ডালি ;

মেয়েরা। কৈ যাস্‌লো মালিনী, ফুলের সাজি লইয়া ?

মালিনী। ফুল ফুটেছে নানা রকম, ডাল পড়েছে নুইয়া।

মালি। আগের ফুল তুলিস্ না লো কলি-কলি !
গোড়ের ফুল তুলিস্ না লো বালি-বালি !

মেয়েরা। মধ্যের ফুল তুলিয়া আনিস্ নাগেশ্বরের মালি।

(মালির প্রস্থান ও ফুল নিয়ে প্রবেশ)

মেয়েরা। নাগেশ্বরের মালি রে !
কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি লইলি ?
কোন্ কোন্ ডালে নিশি পোহাইলি ?

মালি। জইতের ডালে রাঁধলাম বাড়লাম,
অতসীর ডালে খাইলাম লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(এরপর বেত হাতে নিয়ে কুয়াশা ভাঙার পালা।)

মেয়েরা। কুয়া ভাঙুম কুয়া ভাঙুম বেৎলার আগে।
সকল কুয়া গেল অই বরই গাছটির আগে ॥
ওরে ওরে বরই গাছ ! ঝুল্লন দে।

ছয়-কুড়ি ছয়টা বরই লিখিয়া দে ॥
লিখিতে পড়িতে একটা হইল ঊনা।
কাইটা কুইটা ফেলাম্নে শিবের কানের সোনা ॥
শিবের কানের সোনা না লো, বেড়ার মাটি।
আপ্পন ভাই বইন্ লোহার কাটী ॥
লোহা না লো বিয়া করে।
পাড়া ভইরা লো জোকার পড়ে ॥
জয় দিব না লো আমরা জোকার দিব।
সোনা দুইটি ভাই বইন্ কোলে তুইলা নিব ॥

—এইভাবে ব্রত কখন যে যাত্রা হয়ে দাঁড়ায় টের পাওয়া যায় না। কুয়াশা ভাঙার পর তৃতীয় দৃশ্যে অনেক কষ্ট করে পথঘাট দেখিয়ে সূর্যকে ওঠানো হলো। দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্যের সঙ্গে মাধবের কন্যা চন্দ্রকলার বিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম দৃশ্যে বাসরঘরে চন্দ্রকলা আর সূর্যের মধ্যে কথা হচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে চন্দ্রকলার নানান প্রশ্নের উত্তর দেন সূর্য ঠাকুর। কাউয়ায় করে কলমল কলমল, কোকিলে করে ধ্বনি—চন্দ্রকলা দেখে শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'তোমার দেশে যাবো সূর্য, মা বলিব কারে?' সূর্য বলেন, 'আমার মা তোমার শাশুড়ী মা বলিও তারে।' সূর্যের শুধু মা-বাপ ভাই-বোন আছে তাই নয়, আগের পক্ষের স্ত্রী গৌরীও আছেন। সূর্যের ভাঁড়ারের কর্তা হলেন সিকদার। ঠিক যেন বুড়ো নায়েব মশাই। তিনিও আছেন সপরিবারে। সূর্যের সংসারটা যেন অবিকল এক জমিদারবাড়ি। সূর্যের এই বিয়েতে গৌরীর সুখ নেই। তিনি বাপের বাড়ি যেতে

চান। সূর্যের কানে যখন কথাটা পৌঁছুলো তখন বাঁশের চটা দিয়ে তিনি গৌরীকে মারবার ভয় দেখালেন। তারপর চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় সূর্যের দুই ছেলে—বড়ো ছেলের নাম রাল, রাউল বা লাউল ; ছোটো ছেলের নাম শিব, শিবে বা শিবাই। চতুর্থ অঙ্কে লাউলের বিয়ে হলো এবং সূর্যঠাকুর ঠাকুরদা হলেন।

॥ শিবঠাকুর ॥

এ থেকে বোঝা যায়, সূর্য ঠাকুরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার জন্যে সংসারের মায়ায় রীতিমতো জড়ানো হয়েছে। এই ব্রতটির মধ্যে সূর্যদেব শুধু যে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছেন তাই নয়—বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজের অনেক খবর এর মধ্যে ইশারায় লুকনো আছে।

এই ব্রত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সূর্য বা রায় ক্রমে ক্রমে বদলে হয়েছে লাউল বা শিবঠাকুর। মানুষ যাতে গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গোরু আর দরবার-আলো-করা ছেলে পায়—তারই জন্যে জীবন এবং বসন্তের দেবতা সূর্যকে বিয়ে দিয়ে নাতি-পুতি নিয়ে থিতিয়ে বিতিয়ে বসাবার ব্যবস্থা।

শিব আসলে আদিম সমাজেরই মানুষ ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন দলের সর্দার বা মোড়ল। ব্রতের সময় প্রধান জাদুকর, ব্রত যখন নাচ আর নাট্য হয়ে উঠলো, তখন সেই নাচ আর নাট্যেরও গুরু ছিলেন শিব। তারপর নটরাজ চাষবাসের যুগে হলেন ঋতুরাজ। সূর্যঠাকুরের ভূমিকা অভিনয় করে দলের সর্দার আস্তে আস্তে হয়ে দাঁড়ালেন নিজেই শিবঠাকুর। এই

শিবঠাকুর গোড়ায় কিন্তু নিজেও বেজায় খাটিয়ে লোক ছিলেন। ধান ভানবার সময় মেয়েরা তাই শিবের গীত গাইতো। প্রাচীন শিবের ছড়ায় তাই যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে নেশাখোর নিষ্কর্মা ভোলানাথের কোনো মিল নেই!

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিকে চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
কিতা মুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট্পট্।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সটসট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥

ছড়া থেকে মনে হচ্ছে শিব নিজে যতোটা না খাটতেন, ভীম নামে কৃষাণটিকে তার চেয়ে বেশি খাটাতেন। শুধু চাষবাস নয়, ক্ষেতের মশা আর জোঁক তাড়াবার কায়দাকানুন, গ্রহতত্ত্ব এবং বশীকরণের জাদুমন্ত্রও তিনি জানতেন।

॥ শিবের পর কৃষ্ণ ॥

মাঘমণ্ডল ব্রতে আছে সূর্যঠাকুরের বিয়ে। নীলপুজোয় আছে শিব ঠাকুরের বিয়ে। ব্রতটাই পরে বোধহয় পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সূর্যের বদলে মাথা তুলেছেন শিবঠাকুর। এক

জায়গায় জড়ো হওয়া নয়, বাড়ি বাড়ি ঘোরা। ক্রিয়াকর্মের চেয়ে সেজেগুজে গান গাওয়ার দিকেই বেশি ঝোঁক।

নীল বলতে নীলকণ্ঠ মহাদেব। কথায় বলে 'পাট-গোঁসাই'। এক খণ্ড নিম কিংবা বেলগাছের মাথার দিকটা ছুঁচোলো করে কেটে তাতে লাগানো হয় চক্র আর ত্রিশূল। তারপর মাথায় তেলসিঁদুর মাখিয়ে লাল শালু দিয়ে পাট-গোঁসাইয়ের সারা অঙ্গ মুড়ে দেওয়া হয়। তারপর বাড়িতে বাড়িতে নীল নিয়ে সঙ সেজে ঘোরা আর শিবের বিয়ের গান গাওয়া। যারা এইভাবে সঙ সাজে তাদের বলে নীলসন্ন্যাসী। তাদের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় পাগড়ি, পরনে লাল কাপড়, হাতে বেতগাছি। দলের সর্দারকে বলে বালা।

প্রথমে হয় নীলের গান। শিবের বিয়ের খুটিনাটি বর্ণনা। ঠিক তাদের সমাজে যেমনটা হয়। কিন্তু তারপরই হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের স্তোত্র। তার ভাষাও যেমন সংস্কৃত-ঘেঁষা, ভাবের দিক থেকেও তা অলৌকিক দেবতা-ঘেঁষা। বেশ বোঝা যায়, পরের দিকে দেবতার আসন থেকে শিবকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা চলেছে। এর পেছনে বামুন-পণ্ডিতদের হাত আছে।

শিবের পর এলেন কৃষ্ণ। এবার শুধু গান নয়, সেই সঙ্গে কথাও এসে জুটলো। গান আর কথা মিলে তৈরি হলো পালাগান আর যাত্রাগান।

কৃষ্ণের নাম রাই কানু। আরেক নাম বিষ্ণু। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু মানে সূর্য। কাজেই যিনি ছিলেন রায়, তিনিই

হয়েছেন রাই কানু। গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের যে সংসারযাত্রা, তাই থেকেই এসেছে 'সৌরযাত্রা' এবং তার পরে 'কৃষ্ণযাত্রা'। সূর্যদেবের 'রাস' যাঁদের নিয়ে, তাঁরা হলেন রাধা, অনুরাধা, চিত্রা, ও বিশাখা। কৃষ্ণেরও সহচরী তাঁরাই।

দু'টি পালা গান জুড়ে কৃষ্ণযাত্রা। তার মধ্যে শেষের দিকে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা জুড়ে নিয়ে নিমাইকেও অবতার করে তোলা হয়েছে।

॥ পালাগান আর মহাকাব্য ॥

জাদু-বিশ্বাস থেকে একদিকে ধর্ম-বিশ্বাস আবার অন্যদিকে ব্রতনাট্য থেকে পালাগান আর যাত্রা এসে গেলো।

গোড়াতেই বলা হয়েছে : প্রকৃতির মধ্যে একদিন আদিম মানুষ অবাক হয়ে দেখেছে পালাক্রমে মৃত্যু আর জন্ম, যাওয়া আর আসা। ধরা পড়েছে প্রহর-পল, দিন-তিথি, মাস-বছর আর ঋতুচক্র। ক্রমে চাঁদের চেয়েও বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে ঋতুর রাজা সূর্য।

মানুয যখন চাষীবাসী হলো তখনই দেখা দিলো বারোমাসে তেরো পার্বণ। সমস্ত পালপার্বণের পেছনে থাকলো জন্ম আর মৃত্যুর পালা। বাংলাদেশে পালাগান গাইবারও আবার কতক-গুলো নিয়ম আছে। যেমন : রামায়ণ পালাগান। এর মধ্যে আছে পাঁচটি পালা : সীতার বিবাহ, শক্তিশেল, রাবণবধ, পিতা-পুত্র আর লক্ষ্মণবর্জন। যে বাড়িতে ছেলেপুলের জন্ম হবে, সে বাড়িতে গাওয়া হবে 'সীতার বিবাহ' কিংবা 'পিতা-পুত্র' পালা ;

যে বাড়িতে কোনো বয়স্ক লোকের মৃত্যু হয়েছে, সে বাড়িতে গাওয়া হবে 'রাবণবধ' পালা ; যে বাড়িতে কোনো নাবালকের মৃত্যু হয়েছে, সেই বাড়িতে গাওয়া হবে 'লক্ষণবর্জন' বা 'শক্তিশেল' পালা।

পালাগানের এই যুগে সমাজে বড়ো রকমের একটা বদল দেখা গেলো। মানুষ চাষবাসের জোরে তখন বাড়তি খাবার ফলাতে পারছে। সমাজে দেখা দিয়েছে শূদ্র আর ব্রাহ্মণ, দাস আর প্রভু। হাতের কাজ আর মাথার কাজ আলাদা হয়ে গেছে। শিব প্রথমে দেখা দিলেন চাষীর বেশে, তারপর নিষ্কর্মা নেশাখোর হয়ে উঠলেন। সমাজের মাথাওয়ালাদের হাতে জাদুবিদ্যা থেকে একদিকে এলো কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ এবং নানা শস্ত্রশাস্ত্র—অন্যদিকে এলো গীতিকাব্য, পালাগান, যাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের লড়াইটা হলো বিজ্ঞান আর ভেতরকার লড়াইটা হলো শিল্প।

আমাদের দেশে রামায়ণ আর মহাভারত এই সময় মুখে মুখে রচনা হয়েছিলো। রামায়ণ আর মহাভারত কারো একার রচনা নয়। কয়েক শো বছর ধরে অসংখ্য মানুষের তৈরি পালাগুলো জুড়ে জুড়ে এবং ভেঙেচুরে এই মহাকাব্য দুটি গড়ে উঠেছে। বোধহয় তার অনেক পরে জাত-গায়ক কুশীলবদের মুখ থেকে শুনে বাল্মীকিরা লেখেন রামায়ণ আর ব্যাসেরা লেখেন মহাভারত। বাল্মীকি বা ব্যাস কারো একার নাম নয়। দুটি সম্প্রদায়ের নাম।

এই ধরনের পালাগানে একজন থাকতো মূল গায়েন, বাকিরা দোহার হিসেবে ধুয়ো ধরতো। গ্রীক গাথা হোমার-এর ইলিয়াড

আর ওডিসির বেলায় তাই দেখা যায়। পরে বীণা হাতে মূল গায়েনই শুধু থাকলো, বাকিরা আস্তে আস্তে আসর থেকে বিদায় নিলো। তারপর গায়কের হাতের বীণা খসে গিয়ে গায়ক হয়ে উঠলো কবি। গান হলো কাব্য।

রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি—সমস্তই হলো রাজারাজড়াদের যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথা। ভরত রাজবংশ এবং গ্রীক রাজাদের রাজসভায় থাকতো একদল কবিগায়ক—ভারতীয় কুশীলব এবং হোমেরিদাই। এরা ছিলো জাত-কবি। রাজাদের কীর্তিকাহিনী এরা বংশপরম্পরায় সুর করে গাইতো। আজকের কবিয়াল কিংবা তর্জাগায়কদের মতোই আসরে দাঁড়িয়ে তারা মুখে মুখে গান তৈরি করতো। রচনার অনেক পরে মহাকাব্যগুলো লেখা হয়। কাজেই লেখার সময় মূল রচনা যে অবিকল এক থেকে গেছে, তা বলা যায় না। এই মহা-কাব্যগুলোই আবার ভেঙেচুরে নানা লোক নানাভাবে লিখেছে। তা থেকে নানা রকম পালা লেখা হয়েছে।

॥ নাচ বদলে ব্রত ॥

মহাকাব্যের ঢের আগেই যাত্রা আর নাটকের সূচনা হয়েছিলো। ব্রত থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ব্রতপার্বণেরও আগে নাচ। নাচ আর কাজ গোড়ায় ছিলো পিঠোপিঠি। কাজের আগে দল বেঁধে একবার কাজের মহড়া দিয়ে নেওয়া হতো। সেই মহড়াটাই ছিলো নাচ। কাজের ধরন যতো ভালো হতে লাগলো, ততই কাজের আগে নেচে নেবার দরকারও আর থাকলো না।

খাটাখাটুনির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নাচ এবার নানা-রকমের সামাজিক দরকারে লাগলো। সমাজে তখন শুরু হয়েছে কাজ-ভাগাভাগির পালা। একেক দল একেক কাজে হাত পাকাচ্ছে। জাদু জিনিসটা তখন রীতিমতো আলাদা একটা বিদ্যে হয়ে উঠেছে। নাচ আর মহড়া না থেকে হয়ে উঠেছে ব্রতপার্বণ। তার জন্যে দরকার পড়েছে জাদুকর বা পুরুতের।

মহাকাব্যের মূলে ছিলো যুদ্ধবিগ্রহ। যাত্রা-নাটকের মূলে ছিলো চাষবাসের বিস্তার। ফলমূল জোগাড়, মাছমাংস শিকার কিংবা পশুপালনের চেয়ে চাষের কাজটা ছিলো শক্ত। আদিম সমাজে পুরুষরা লড়াইয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতো বলে প্রথম প্রথম মেয়েদেরই ওপর চাষের ভার পড়েছিলো। কাজেই নতুন যেসব ব্রতপার্বণ দেখা দিলো, তাতে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী আর ষষ্ঠী ঠাকরুনেরাই হয়ে উঠলেন প্রবল।

এই সময় সূর্য রাজা বা রায় হলেও চাঁদই ছিলো প্রধান। চাঁদ ছিলো রানী। বীজ মরে গিয়ে যেমন ধান হয়, তেমনি সমাজে সুখশান্তির জন্যে রাজাকেও প্রাণ দিতে হতো। রোজ সন্ধ্যেয় মরে গিয়ে সূর্য যেমন রোজ সকালে বেঁচে ওঠে, তেমনি রাজা প্রাণ দিলেও আবার প্রাণ ফিরে পায়। রাজা অমর—এই বিশ্বাসেই রাজাকে বলি দেওয়া হতো। পরে সত্যিকার রাজাকে বলি না দিয়ে তার বদলে পশুবলির ব্যবস্থা হলো। সেই সমাজটাকে বলা হতো ক্ষেত্রপ্রধান সমাজ। পুরুষরা ছিলো বীজ ; মেয়েরা ছিলো ক্ষেত্র। রাজা ছিলো রানীর হুকুমের চাকর।

॥ ক্ষেত্রব্রত আর মেঘারানী ॥

আজও আমাদের দেশে তার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় 'ক্ষেত্রব্রতে'র মধ্যে। ক্ষেত্রব্রতই হয়েছে লক্ষ্মীব্রত। লক্ষ্মীব্রতের কথা থেকে জানা যায় রাজা নেহাত গরিব, খাবার পাতে ঘি পায় না এবং রানীর কথামতো প্রাণ দেয়। এর মধ্যে সেই পুরনো সমাজের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আজও বৃষ্টির জন্যে গ্রামদেশে "মেঘারানীর কুলো" নামাতে হয় আর গাইতে হয় :

হ্যাদে লো বুন মেঘারানী
হাত-পাও ধুইয়া ফেলাও পানি।
ছোট ভুঁইতে চিন্‌চিনানি
বড় ভুঁইতে হাঁটু পানি।
মেঘারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি লামে লো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালা মেঘা ধলা মেঘা বাড়ি আছো নি ?
গোলায় আছে বীজধান বুনাইতে পারো নি ?

রানীদের যে সেকালে কতোখানি দাপট ছিলো, 'ময়নামতীর গান' পড়লেই তা বোঝা যায়। রানী ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা ; হাড়িসিদ্ধা ছিলেন তাঁর গুরুভাই। ময়নামতী নানা রকমের ভোজবাজি জানতেন।

'ময়নামতীর গানে'র মধ্যেই আবার দেখা যায় রানী আর রাজাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। রাজার সঙ্গে তান্ত্রিক পুরুতদের রেষারেষি দেখা দিয়েছে। চাষবাস যতো বাড়ছে, ঘরের আঙিনা ছাড়িয়ে যতোই তা মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে—

ততই সমাজে ক্ষেত্রের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে বীজ, মেয়ের চেয়ে পুরুষ, রানীর চেয়ে রাজা, চাঁদের চেয়ে সূর্য।

রা'লদুর্গার ব্রতে দেখা যায় হরপার্বতীর পাশাখেলায় হারজিত নিয়ে শিব-দুর্গার মধ্যে রেষারেষি।

এমনিভাবে সমাজ ক্রমান্বয়ে বদলেছে। যেসব রথীমহারথী যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে মেতে থাকতো, তারা হয়ে দাঁড়ালো একেকজন বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা। বিরাট এলাকা জুড়ে দেখা দিলো তাদের রাজ্য আর রাজবংশ। তারা হলো প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। তার পরে যখন দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের চলন হলো, তখন ক্ষত্রিয় রাজাদের পাল্টা শক্তি হিসেবে মাথা তুলতে লাগলো বৈশ্য, বণিক আর শ্রেষ্ঠীর দল। তখন চাষবাস ছেড়ে লক্ষ্মী এসে ভর করলেন বাণিজ্যে। জমির চেয়ে বড়ো সম্পদ হয়ে দেখা দিতে লাগলো কড়ি। রাষ্ট্রশক্তি তখনও রাজামহারাজাদের হাতে ; কিন্তু সওদাগরদের দাপট বেড়ে চললো। আস্তে আস্তে তারা যখন রাষ্ট্রশক্তির দিকে হাত বাড়ালো তখন শুরু হলো ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের, রাজা আর শ্রেষ্ঠীদের লড়াই। এই সময় গড়ে উঠলো বড়ো বড়ো নগর আর বন্দর। দেশে দেশে ছুটলো সওদাগরদের সপ্তডিঙা। রাজা আর সওদাগরের এই নাটকীয় সংগ্রামের ভেতর দিয়েই দেখা দিলো যাত্রা আর নাটক। আমাদের দেশে সেই যুগটাকেই বলে বৌদ্ধযুগ। ব্রাহ্মণদের হটিয়ে দিয়ে বৈশ্যেরা তখন এগিয়ে আসছে। সওদাগরদের কাছে রাজারা হটে যাচ্ছে।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে এ দেশের সমাজ যে ছোটোয়

বড়োয় ভাগ হয়ে যেতে থাকে, তার বিস্তর প্রমাণ আছে। এই রকমের একটি প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের গল্প। একদিকে ইন্দ্রের অগাধ ঐশ্বর্য, অন্যদিকে শুনঃশেপের বাবা অজীগর্ত বেচারীর দিনান্তে দুমুঠো ভাতের জোগাড় নেই। লোভে পড়ে তাকে ছেলে বিক্রি করতে হলো। রাজসূয় যজ্ঞে সেই ছেলেকে বলি দেওয়া হবে। ছেলেকে হাড়কাঠে দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল্লাদেরা বেঁকে বসলো। শুনঃশেপ ধিক্কার দিয়ে বলেছিলো : সেই পুরনো ঋত আমরা হারিয়েছি। আর সেই সঙ্গে মুখের ওপর ঘৃণাভরে জানিয়ে দিয়েছিলো—তোমরা মানুষ হও।

॥ শৈলূষ ॥

'তোমরা মানুষ নও'—যারা মারছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মার খাচ্ছে তাদের এ যেন প্রথম গর্জে-ওঠা প্রতিবাদ। জল্লাদরা শুনঃশেপের মতোই ক্রীতদাস্ ছাড়া কিছু নয়। তাই নিজেদেরই একজন সগোত্রকে মারতে তাদের হাত ওঠেনি। শুধু তাই নয় ; শুনঃশেপ তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে সেই হারানো দিনগুলোর কথা—যখন সমাজে সবাই সমান ছিলো। যখন গোলাম আর মনিবে, গরিব আর বড়োলোকে সমাজ ভাগ হয়ে যায়নি।

কিন্তু এর সঙ্গে যাত্রা কিংবা নাটকের সম্পর্ক কোথায় সম্পর্কটা কোথায় দেখা যাক।

বৈদিক যুগের কাছাকাছি সময়ে একটি শব্দ পাওয়া যায়—

'শৈলূষ'। এর দুটি অর্থ আছে। যারা বলির ব্যাপারে জল্লাদ-বৃত্তি করতো এবং যারা নাটক করতো তাদেরই বলা হতো 'শৈলূষ'। কোথাও কোথাও কোল-ভীলদেরও এই নাম দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, বলির জায়গায় সে সময় গান হতো। যাকে বলি দেওয়া হচ্ছে পশু হলেও তার প্রতি জল্লাদের একটা মমতা থাকতো। কেননা একই মনিবের তারা অধীন। তাই বলির পর সেইসব পশুদের গুণগান করার রেওয়াজ কোনো কোনো দেশে দেখা যায়। এমনভাবে স্তুতি করা হয় যেন বলির পশুরা পশু নয়—অলৌকিক শক্তিধর মানুষ। পশুর নাম করে সেকালের শৃঙ্খলিত মানুষ নিজেদেরই সঙ্ঘশক্তির স্তুতি করতো।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। তখনই এদেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘসঙ্ঘারামের ভেতর দিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিলো। বছরের একেকটি নির্দিষ্ট দিনে যে যেখানে আছে এক জায়গায় জড়ো হয়ে দৃশ্যপট টাঙিয়ে নাচ, গান উৎসব হতো। এক কথায় বলা যায়, যাত্রা হতো।

॥ পালা বদলে ॥

যাত্রাগান আর নাটকের লোকায়ত রূপ পরে আর থাকেনি। এর পর আবার যখন সমাজে নতুন করে দিনবদলের পালা এলো, তখনই নতুন চেহারায় নাটক দেখা দিলো। এতোদিন জমিই ছিলো সমাজের একমাত্র সম্পদ। এবার শিল্পবাণিজ্যের ওপর ভর করে নতুন একদল মানুষ মাথা তুললো। গড়ে উঠলো

নগর, বন্দর। দেখা দিলো নগরসঙ্কীর্তন—গান করে যাত্রা, শোভাযাত্রা। গ্রীকদের দেশে যার নাম 'কমেডি'। গ্রীসে গণতন্ত্র থেকেই এসেছিলো নাটকের প্রেরণা।

ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের জোয়ারের মুখে নতুন করে দেখা দিলো নাটক। তার কেন্দ্র হলো নগর। তাতে স্থান পেলো একদিকে রাজ্যলোভ, কুটিল ষড়যন্ত্র, ভাঁড়ামি, বিলাস-ব্যসন, ভদ্র পোশাক-পরা দুর্নীতি আর সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা; অন্য-দিকে ভুলে-যাওয়া চরিত্র আর ঘটনা, হারানোর পর বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফিরে পাওয়ার গল্প। শেষের অংশে পড়ে অশ্বঘোষ আর কালিদাসের নাটক। এর ভেতর সাধারণ মানুষের আশা আর উদ্বেগ ধরা পড়েছে। গুপ্ত রাজাদের আমলে যখন দেশের লক্ষ্মী সত্যিই বাণিজ্যে বাস করছিলেন, তখন সমস্ত দিক থেকেই শিল্প-সাহিত্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু এই এগোনোর মধ্যেই পিছিয়ে পড়ার দিক ছিলো। তা এই: সাধারণ মানুষকে অনেকখানি পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া। তারই ফলে বোধ হয় পরে শিল্পসাহিত্যে এক অন্ধকার যুগ দেখা দেয়।

কিন্তু যাত্রাগান গ্রামের মানুষদের মধ্যে টিঁকে থাকলো। গ্রাম বলতে তখন আর ষোলো আনা বোঝায় না। যারা হাতের কাজ করে তারা নিচু। যারা মাথার কাজ করে তারা উঁচু।

নিচুতলার মানুষেরা নাচ-গান-নাটকের ধারা নিজেদের শিবের জটার মধ্যে যেন বেঁধে রাখলো। তাই আজ সেই পুরনো দিনের হারানো শিল্প খুঁজে পেতে হলে যেতে হবে হাঁড়ি-ডোম-বাগ্দীর ঘরে। তাদের ঘরে বাঁধা শুধু আমাদের অতীত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎও

যম-নিয়তি-যক্ষ

যাত্রা শুনতে গিয়ে খুব মজা লাগে যখন কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বিবেক কিংবা নিয়তির গান শুরু হয়ে যায়। খাঁড়া নাচাতে নাচাতে ছুটে এসে হুম্ করে সে গেয়ে ওঠে: মাথার ওপর ঝু-লৃছে খাঁড়া……

বিবেক বেচারী আজ আমাদের কাছে বেশ খানিকটা হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রায় আজ সে একদম ফাল্তু। তাই বলে বরাবর তার অবস্থা এমন ছিলো না।

এক সময়ে বিবেকই ছিলো যাত্রার মূল গায়েন—বলা যায়, নাটের গুরু। ছাড়া ছাড়া বিষয়গুলোর মধ্যে বাঁধুনি আনা, সমস্ত ঘটনাকে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে খানিকটা ব্যাখ্যাকার হিসেবে হাজির হওয়া—এই ছিলো বোধ হয় বিবেকের কাজ।

॥ বিবেকের গান ॥

'বিবেক' মানে: পরস্পরের বাদানুবাদের ভেতর দিয়ে বস্তুর স্বরূপ বিচার। গ্রীক ভাষায় যাকে বলে 'ডায়ালেগো'। বিবেকই যে ক্রমে আলাদা হয়ে কবির লড়াই, তরজা এবং হাফ-আখড়াই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

পালপার্বণ থেকেই এসব উঠেছে। পালপার্বণের মূল কথা হলো ঋতুবন্দনা—বারোমেসে গানের মধ্যে যার পরিচয়। আদিম যুগ থেকে এবং বিশেষ করে চাষবাসের যুগে মানুষ দেখেছে মৃত্যু

আর জীবন। যাওয়া আর আসা, অন্ধকার আর আলোর দ্বন্দ্ব। মৃত্যু আর জীবনের এই পালা থেকেই গড়ে উঠেছে জাতুমন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পুজো, নাচ-গান-নাটক। গোড়ায় দেবতা ছিলো না—শুধু ছিলো ঋত আর ঋতু। প্রকৃতিকে দলবদ্ধভাবে নকল করলেই প্রকৃতি মুঠোয় এসে যাবে—এই ধারণা থেকেই আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম।

সমাজে যখন দলের ওপর দলপতির প্রাধান্য দেখা দিলো তখনই এলো ঋতুচক্রের দেবতা—সূর্য, শিব, কৃষ্ণ। দেবতা গোড়ায় অমর ছিলো না—তাকে মানুষের মতো, জীবপ্রকৃতির মতোই মরতে হতো। মৃত্যুর পর হতো নতুন জন্ম। যেমন মাটির নিচে বীজ মরে ধান হয়। তখন জন্ম আর মৃত্যুর ছিলো একই দেবতা। যমের তখনও জন্ম হয়নি।

পালপার্বণে আর ঋতু-উৎসবে দেবতার ভূমিকা নিলো জাতুকর-পুরুত-ঋত্বিক। ক্রমে সমবেত ব্রত-উৎসব থেকে গাথা আর গান যখন আলাদা হয়ে যেতে লাগলো, তখন পালপার্বণের নেতা ক্রমে হলো পালাগানের প্রণেতা—মূলগায়েন। পালাগানের প্রণেতাই পরে হলো যাত্রা বা পালার নট বা অভিনেতা। একই দেবতার মধ্যে যেমন জীবন আর মৃত্যুর দ্বন্দ্ব, একই দেবতার যেমন তুই চরিত্র—তেমনি গোড়ার দিকে একই নট তুটো চরিত্রের অভিনয় করতো। কথকতার মধ্যে, বহুরূপীর সাজপোশাকের মধ্যে আজও তার রেশ দেখতে পাওয়া যায়।

পরে সমাজে যতোই কাজ ভাগাভাগি হতে লাগলো ততোই, আলাদা আলাদা দেবতা দেখা দিলো। যম বেচারীর কাঁধে

চাপলো মৃত্যুর দপ্তর। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যেকার যোগসূত্রটা ছিঁড়ে যেতে লাগলো।

সংস্কৃত নাটকে যে ছিলো সূত্রধার, তার কাজ ছিলো পাত্রপাত্রীদের চিনিয়ে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে তাদের পরিণামও আগে থেকে ছকে দেওয়া। যাত্রায় বিবেকের ভূমিকায় এই সূত্রধারকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায়। আগে থেকে সমস্ত কিছু বলে দেবার মতো ক্ষমতা আজ আর তার নেই। দেখে মনে হয়, নাটকের ঘটনাগুলোর ওপর তার যেন পুরো দখল নেই—ঘটনার মাঝে পড়ে সে ঘটনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করছে। তার এই অসহায়তাই পরে তাকে বিদূষক এবং ভাঁড় করে তুলেছে।

।। নিয়তি ॥

বিবেকের রকমফের হিসেবে যাত্রার আসরে দেখা দেয় যম, যমদূত, নিয়তি। এদের প্রত্যেকেরই পেছনে রয়েছে ঋতুচক্র আর জন্মমৃত্যুর অমোঘ নিয়ম। নিয়ম থেকেই এসেছে যম আর নিয়তি। কার্য-কারণের সূত্রটাই হলো নিয়ম। আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যে কার্য-কারণের হাতুড়ে নিয়ম অবিষ্কার করেছিলো, তারই নাম জাদু। এই জাদুই পরে হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ধর্ম।

প্রকৃতির মধ্যে যেমন নিয়ম, তেমনি মানুষের মধ্যে সমাজ। প্রকৃতির নিয়ম যেমন ঋতু, মানুষের নিয়ম তেমনি ঋত। ঋত বলতে বোঝাতো মানুষের গোটা দল, আস্ত অবিভক্ত সমাজ।

জাদুর যুগে মানুষ ভাবতো, প্রকৃতির ওপর তার অবাধ অধিকার। তেমনি সমাজেও ছিলো সকলের সমান এবং অবাধ অধিকার।

কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের ছেলেমানুষী জাদুবিশ্বাস বাস্তব জীবনে ঘা খেতে লাগলো। প্রতি পদে ঠেকে ঠেকে মানুষ আঁচ করতে পারলো—প্রকৃতি নিজের খেয়ালে চলে। প্রকৃতি মানুষের কথার বাধ্য নয়। তখনই এলো প্রকৃতিকে তোয়াজ করার ব্যাপার। প্রকৃতিকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া নয়, প্রকৃতির কাছে মানত করা। সেই সঙ্গে এলো পুজো-আর্চা, দেবদেবী, পাণ্ডা-পুরুত।

প্রকৃতির নিয়মকানুন জেনে প্রকৃতিকে বদলানোর ব্যাপারে সে যুগে যারা সিদ্ধহস্ত ছিলো, তারাই হলো সে যুগে পুরুত-ব্রাহ্মণ-সিদ্ধাচার্য। তাদেরই হাতে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রথম হাতেখড়ি। প্রকৃতির ওপর এই অধিকার-ভেদ থেকে সমাজে এলো অধিকার-ভেদ। বর্ণাশ্রম আর জাতবিভাগ। এরই ফলে সমাজে দেখা দিলো ব্যক্তিগত মালিকানা, অধিকারী আর অনধিকারী, মনিব আর ক্রীতদাস, ধনী আর নির্ধন। দেখা দিলো মন্ত্রগুপ্তি আর ধর্ম।

প্রকৃতিকে একদিক থেকে জেনে মুঠোয় আনা হলো ; কিন্তু পুরুত-ব্রাহ্মণদের হাতে পড়ে সেই জানার ব্যাপারটা অজ্ঞেয় রহস্য হয়ে দাঁড়ালো। প্রকৃতির নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধির বিধান। তার ওপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই। হাতেকলমে মানুষ আগের মতোই প্রকৃতির ওপর নিজের ইচ্ছে খাটিয়ে ফসল ফলাতে লাগলো, কাপড় বুনতে

লাগলো—কিন্তু মনের ওপর চেপে বসলো অন্ধ বিশ্বাস।

কাজ আর কথা, হাত আর মাথা, বস্তু আর মন আলাদা হয়ে গেলো। যারা মাথার কাজ করে, তারা হলো ওপরতলার লোক—দেবকুল। যারা হাতের কাজ করে, তারা হলো নিচের তলার লোক—দৈত্যকুল। সমাজে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফল এলো।

ছোটোয় আর বড়োয়, রাজায় আর প্রজায় সমাজ ভাগ হয়ে গেলো। তার মানে এ নয় যে, দুদল একদম আলাদা হয়ে গেলো। তা যদি হয়, রাজার দল তো তাহলে না খেয়ে মরবে। কাজেই মিলে-মিশে থাকা দরকার, সমাজটাকে এক রাখা দরকার। রাজার দলই হলো ভগবানের অবতার, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা। গোড়ায় রাজারা প্রজার উপকারে লাগতো। রাজারা ছিলো প্রজাদের মাইনে-করা ক্ষেতওয়ালা। দারোয়ানি করে তারা ছ ভাগের এক ভাগ ফসল পেতো। পরে রক্ষকই হয়ে দাঁড়ালো ভক্ষক। লোভ যতো বাড়তে লাগলো ততোই তারা হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর অত্যাচারী।

নিয়তি বিকট যমের মূর্তি নিলো। দেবতারা হলো নিষ্ঠুর। তাদের চাহিদার শেষ নেই। পান থেকে চুন খসলে তাদের হাতে অশেষ ভোগান্তি।

কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে উল্টোফলও ফললো। নীচের তলার মানুষ সেই অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করেনি। কখনও তারা মালিকের দলকে ঘা দিয়েছে সোজাসুজি, কখনও ঘা দিয়েছে আড়াল থেকে। রাজদণ্ড নিয়ে নানাভাবে দুদলে কাড়াকাড়ি হয়েছে।

সমাজের মাথায় যারা তারাই নিয়তি। সমস্ত সামাজিক ঘটনার লাগাম তাদেরই হাতে। তাই নাটকের একেবারে গোড়ায় থেকে সেই নিয়তিই নাটকের গতি আগে থেকে বেঁধে দিতো। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের পাল্টানে পড়ে সমাজকর্তাদের পক্ষে বরাবর সূত্রধার হয়ে থাকা সম্ভব হলো না। নিয়তিকে হটে যেতে হলো। তার আইন অমান্য করে বসেছে জীবন-রঙ্গমঞ্চের পাত্রপাত্রীরা। তাই নিয়তিকেও নট সেজে ঘটনার মাঝে পড়ে ঘটনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করতে হলো। ঘটনার ওপর দখল যতোই সে হারিয়ে ফেলে ততই সে মরীয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। খাঁড়া হাতে করে বারবার দেখা দিয়ে যতোই সে হাত-পা ছোঁড়ে, ততই সাধারণ মানুষ তাকে ভাঁড় মনে করে হেসে ওঠে।

নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের পাত্র। তখনই নিয়তির হাতবদলের প্রশ্ন ওঠে।

॥ যক্ষের পালা ॥

এবার নিয়তির বেশে দেখা দেয় যক্ষ। তার কুতকুতে চোখ। কদাকার মুখ। সব সময় কী-খাই কী-খাই। আসল রূপটাকে ঢেকে রাখে সে সোনা-রুপো-তামার চাদরে।

সেই যক্ষের ধন টাকাকড়ি। গোড়ায় সে মানুষের ভারি কাজে লেগেছিলো। বেচা আর কেনার ব্যাপারে মাঝ-পড়া হয়ে মানুষের কাঁধের বোঝা সে বেজায় হাল্কা করে দিয়েছিলো। চাষী হাঁসমুরগী নিয়ে হাটে যেতো। খদ্দের হাঁসমুরগী নিয়ে তাকে টাকা

দিতো। সেই টাকায় সে গামছা-কাপড় যা দরকার কিনতো।

কিন্তু কিছুদিন এইভাবে চলার পর এক নতুন ব্যাপার দেখা দিলো। তখন আর কেনার জন্যে বেচা নয়, বেচার জন্যে কেনা। সওদাগর সস্তায় জিনিস সওদা করে আর চড়া দরে বেচে। ফলে তার হাতে লাভ থেকে যায়। সেই টাকা আবার সে একইভাবে খাটায়। সওদাগরের নজর জিনিসের দিকে নয়, টাকার দিকে। এমনি করে শুরু হয় টাকার পেছনে ছোটা। টাকা আর মধ্যস্থ রইলো না। টাকাই হলো সর্দার, টাকাই সর্বেসর্বা। 'টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে। হাতি দিয়ে হাতি বাঁধে॥'

টাকা খাটাতে খাটাতে একদিন সওদাগর দেখে সর্বনাশের দোর-গোড়ায় সে পোঁছে গেছে। তখন সে বোঝে টাকার পেছনে নয়, এতোদিন সে সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছে। সোনার হরিণ নয়, আসলে সে রাক্ষস মারীচ।

গ্রীক পুরাণে মিদাসের গল্প আছে। যে রাজ্যে সোনার খনির ছড়াছড়ি, মিদাস ছিলো সেই রাজ্যের রাজা। একবার সে বর চেয়েছিলো—যা কিছু সে ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে যায়। সে যা চেয়েছিলো তাই হলো। যাতেই সে হাত দেয় তাই সোনা হয়ে যায়। খেতে বসে সে মাথায় হাত দেয়। যা কিছুই মুখে তোলে তাই দেখে সোনার ডেলা। বেচারী শেষ পর্যন্ত তাল তাল সোনার মধ্যে হা-অন্ন হা-অন্ন করে তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে মরে গেলো।

আমরা বলি অক্ষির অর্থ চোখ। তার মানে, চোখের বদলে বসছে অক্ষি। টাকাকড়ির ভালো নাম অর্থ। তার মানে

টাকাকড়ির কাজ অন্য কিছুর বদলে বসা, শুধুমাত্র বাহন হওয়া। টাকাকড়ির জন্মও সেই কারণে। কিন্তু টাকাকড়ি শেষ পর্যন্ত আর ঠিক অর্থ হিসেবে রইলো না। তার ভাবখানা দাঁড়ালো এই যে, আমিই সব ; আমাকেই শুধু দেখো। এতোদিন টাকাকড়ি ছিলো জিনিসপত্রের বাহন, এবার জিনিসপত্রগুলোই হলো টাকা-কড়ির বাহন। টাকাকড়ি বাদবাকি সকলের ঘাড়ে চেপে বসলো।

॥ উল্টো ছাপ ॥

আয়নায় যেমন উল্টো ছাপ পড়ে, ডান দিকটা হয়ে যায় বাঁ দিক—তেমনি টাকাকড়িও তার আয়নায় সব কিছু উল্টো করে দেখাতে লাগলো। দেখা গেলো :

মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥

লোকে জিজ্ঞেস করলো : পৃথিবীটা কার বশ ? প্রতিধ্বনিতে তার উত্তর পাওয়া গেলো : পৃথিবী টাকার বশ।

যার টাকা, তার বল। কাজ হয়ে গেলো ছোটো। টাকা হলো বড়ো। টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায়। সব কিছুই কানা কড়ির কেনা-গোলাম। টাকায় পাওয়া যায় আত্মীয়-বন্ধু। টাকার অবাধ গতি।

টাকা, টাকা, টাকা।
গোপলা হলো গোপাল জ্যাঠা, মঙ্গলা হলো কাকা॥
টাকা, তুমি যাও কোথা ?
পিরীত যথা।

আসবে কবে ?
বিচ্ছেদ যবে ॥

আইন-আদালতও টাকার মুঠোয়। তাই কথায় বলে : টাকা যার, মামলা তার। টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

শুধু কাঠের পুতুল কেন, দেবতারাও বড়োলোকের দুয়োরে বাঁধা পড়েন। গরিব লোকে তাই দুঃখ করে বলে :

কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই।
কড়ি পেলে কৃষ্ণ পাই ॥

এতোদিন প্রজার মাথার ওপর ছিলো জমির মালিক রাজা। চাষীরা তাকে চোখে দেখতো, তার পেয়াদার হাতে মার খেতো আর ফসলে খাজনা গুনতো। সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলো প্রত্যক্ষ। তাকে বোঝা যায়, তার কাছে দরবার করা যায়।

কিন্তু আস্তে আস্তে বাজার আর টাকাকড়ি হয়ে উঠলো মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। তার নিচে চাপা পড়লো মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্ক। টাকাকড়ির পাল্টানে পড়ে এক অদৃশ্য সুতোয় মানুষের ভাগ্য বাঁধা পড়লো।

॥ মানুষের হাতে ॥

চ্যাংমুড়ি-কানির মতো এক অন্ধ নিয়তির হাতে আক্রান্ত হলো মানুষের জীবন-ধন-মান। এক ক্ষমাহীন অভিশাপের মধ্যে যেন এ যুগের সকাল হচ্ছে :

জাগো ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইলো কাল নিদ্রা, মোরে খাইলো কী ?

চাঁদ সদাগরের কাছে মনসা হলো চ্যাংমুড়ি-কানি। মনসার পায়ে চাঁদ কিছুতেই মাথা নোয়াতে রাজী নন। ফলে চাঁদ সদাগরকে হারাতে হলো ছয়-ছয় পুত্র, সাত-সাত ডিঙা। চাঁদ তবু প্রতিজ্ঞায় অবিচল।

বংশের শেষ বাতি লখিন্দরকেও মনসার হাত থেকে বাঁচানো গেলো না। স্বামীর শব নিয়ে কলার ভেলা ভাসালেন বেহুলা। শেষ পর্যন্ত লখিন্দর ফিরে পেলো প্রাণ। চাঁদ ফিরে পেলেন তাঁর সাত-সাত পুত্র, তাঁর চৌদ্দডিঙা মধুকর।

কিন্তু ঘাট স্বীকার করতে হলো নিয়তির কাছে। মনসাকে পুজো দিতে হলো। কিন্তু চাঁদ পুজো দিলেন বাঁ হাতে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। পরাজয়ের মধ্যেও মাথা তুলে থাকলো বিজয়ীর প্রতি বিজিতের অবজ্ঞা। মনসা পুজো পেলেন। কিন্তু সে পুজোয় শ্রদ্ধা থাকলো না। চাঁদ সদাগরের ফেরানো মুখে জেগে থাকলো নিয়তির প্রতি নিরুপায় মানুষের চাপা রাগ। কোনো একদিন জ্বলে ওঠবার অপেক্ষায়। আর শমীবৃক্ষে তোলা থাকলো চাঁদ সদাগরের সেই হেঁতালের লাঠিগাছটি।

পালট পুরাণ

আকাশ-ছোঁয়া প্রকাণ্ড বাড়ি। তার পাশেই প'ড়ো জমিতে এক-খাটালে মোষ-মানুষ। হুস্ করে ছুটে যায় ট্রাম আর বাস। তার গা ঘেঁষে টিকিয়ে টিকিয়ে চলে গোরুর গাড়ি ঠেলা-গাড়ি। হাসপাতালের সামনে গাছগাছড়া পোকামাকড় বিছিয়ে বসেছে দাড়িওয়ালা হেকিম। সেকাল আর একাল যেন আড়াআড়ি হয়ে আছে।

বারোয়ারি পুজোয় তরজা গান হয়। গাঁ থেকে নাম-করা কবিওয়ালা আসে। সঙ্গে ঢোল-কাঁসি আর একদল দোহার। আসরে দাঁড়িয়ে একটানা গড় গড় করে গান বলে।

॥ কবিতা বলা ॥

শুনে খুব ভালো লাগলো। আসর ভাঙবার পর কবিওয়ালাকে গিয়ে বলা গেলো : আমাদের কাগজের জন্যে একটা কবিতা লিখে দিন না। কবিওয়ালা বলবে : আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। লিখতে তো জানি নে।

সে কি কথা ! আচ্ছা, আসরে যেটা বললেন সেটাই আরেক-বার না হয় বলুন—লিখে নিই।

কবিওয়ালা বলবে : তা কি ছাই মনে আছে ! তখন আসরে দাঁড়িয়ে ভাব এসেছিলো বলেছি।

লেখার সঙ্গে কবিওয়ালার আড়ি। লোকজন ভিড় না করলে, ঢোল-কাঁসর না বাজলে, দোহারের দল ধুয়ো না ধরলে তার কবিতা

বেরোয় না। কবিওয়ালা কবিতা লেখে না, কবিতা বলে।

দিন দিন তার পশার কমে আসছে। গাঁয়ের লোকের হাতে পয়সা নেই। আগে তবু জমিদারবাবুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ডাক পড়তো। আজকাল তাঁরা শহরের বাসিন্দা। শহরে আবার সিনেমা-থিয়েটারের দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই কবিওয়ালার গান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পেটের দায়ে আজ তাকে হতে হচ্ছে হয় গাঁয়ের জনমজুর, নয় শহরের কুলি। ছাপাখানা, সিনেমা, রেডিও, গ্রামোফোনের কাছে দিন দিন তাকে হটে যেতে হচ্ছে।

॥ কবিতা লেখা ॥

কবিওয়ালার জুড়িদার হয়ে দেখা দিয়েছে কবি। সে কবিতা বলে না, কবিতা লেখে। একা ঘরের মধ্যে নিরিবিলিতে বসে লেখে। সে কবিতা বই হয়ে ছেপে বাজারে যায়। বাজার থেকে যায় পাঠকের ঘরে। পাঠক সে কবিতা ভিড়ের মধ্যে বসে শোনে না। একা একা নিরিবিলিতে বসে মনে মনে পড়ে। এই হলো একালের কবিতা।

কবি হয়ে পড়েছে একা। পাঠকও একা। ভাবের ঘোরে লেখা নয়। ভেবে চিন্তে লেখা। তা ছাড়া আজকের দিনে লেখা অমনি মুখের কথা নয়। লেখার জন্যে অনেক তালিম দরকার। যে কেউ ইচ্ছে হলেই লিখতে পারে না।

কবিওয়ালা যে ভাষায় গান বাঁধে, সে ভাষায় গাঁয়ের মানুষ কথা বলে। তাই তার গান সবাই বোঝে। লেখা-পড়া জানা না-

জানায় কোনো তফাত হয় না। কবিওয়ালা হলো গাঁয়ে দশজনের একজন। যারা মাঠে ধান বোনে, কামারশালে হাপর টানে, করাত দিয়ে কাঠ চেরে—তাদেরই সঙ্গে তার ওঠা-বসা, তাদেরই ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো তার ভাগ্য। আসলে যে গান সে গায়, তা একা তার নয়। সকলের মনের কথাটাকে গানের মধ্যে সে ধরে দেয়। গোটা গ্রাম যেন তার মুখ দিয়ে কথা বলে।

আর একালের কবি? তার অবস্থাটা বড়োই করুণ। কথা-বার্তার আকাঁড়া ভাষাটাকে ঝেড়েঝুড়ে নিতে হয়। ঘসলে মাজলে তবেই হবে সেটা পুঁথির ভাষা। ইচ্ছে থাকলেও অবিকল মুখের ভাষায় লেখা যায় না। কবিতার পাঠক সবাই নয়। যারা পড়তে পারে, শুধু তাদেরই জন্য লেখা। তা ছাড়া আজ যারা কবিতা লেখে তারা মাঠে ধান নিড়োয় না, কলে কাজ করে না—বড়ো জোর মাথা খাটিয়ে খায়। গতর খাটানোর সঙ্গে মাথা খাটানোর, কাজের সঙ্গে কবিতার, পাঠকের সঙ্গে কবির মুখ দেখাদেখি নেই বললেই চলে।

॥ এর পেছনে ॥

গাঁয়ের কবিওয়ালা আর শহরের কবি--দুজনেরই আজ এক হাল। কার পাকচক্রে কবিতার আজ এই দশা?

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে পাওয়া যায় যক্ষপুরীর বর্ণনা :

> যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়। কাউকে আস্ত রাখতে চায় না।

যক্ষপুরীর মানুষগুলো বিশুর মুখ দিয়ে বলে উঠেছে : "যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছোয় না। তাই আমরা ওদের কাছে মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।"

কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে যক্ষপুরীর আরও এক বর্ণনা আছে :

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী—
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকাসাগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা,
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।

যক্ষপুরীর এ যেন অন্য চেহারা। বাংলার প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদনের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে তার জয়ধ্বনি।

কোন্‌টা সত্যি ?—দুটোই সত্যি। আগে আর পরে। আগে মাইকেল, পরে রবীন্দ্রনাথ।

মাইকেল লিখেছিলেন সেই যুগে, যখন আকাশে গনগন করছে বর্তমান সভ্যতার সূর্য। বনজঙ্গল ভেঙে, নদী-পর্বত ডিঙিয়ে লোহার পাতে বাঁধা হচ্ছে পথ। এ-জায়গার মানুষ রেলগাড়িতে হুস্‌ করে ও-জায়গায় যাচ্ছে। এ-জায়গার জিনিস যাচ্ছে ও-জায়গায়। গাঁয়ের মানুষ দলে দলে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে দেখছে : যেখানে আকাশ আর মাটি শেষ হয়ে গিয়েছে বলে তারা এতোদিন মনে করেছিলো, সেখানে শেষ হয়নি— তারপরে আরও পৃথিবী আছে। আনি-দুআনি পাই-পয়সার সেপাইসামন্ত নিয়ে সোনার মোহর রুপোর টাকা দিগ্বিজয়ে

ফেরে। তার ফু লেগে বড়ো বড়ো বট-অশত্থ ভেঙে পড়ে। তার হাত লেগে প্রকৃতির চেহারা পাল্টে যায়।

আমাদের দেশে সেই সভ্যতার বাহন হয়েছিলো ইংরেজ। মাইকেল এবং তাঁর সময়কার অনেকেই তার প্রথম ছটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলো দেখে তাঁরা পতঙ্গের মতো ছুটে গিয়েছিলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন সর্বনেশে আগুন। প্রথম আধুনিক বাঙালী কবির সেই নিদারুণ আশাভঙ্গ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ধরা পড়েছে।

॥ মাইকেল ॥

প্রথম যৌবনে মাইকেলের একমাত্র সাধ ছিলো মনেপ্রাণে, চালচলনে পুরোদস্তুর সাহেব হওয়া। তিনি তার জন্যে প্রচলিত ধ্যানধারণা, সনাতন রীতিনীতি ভেঙে চুরমার করেছিলেন। কোনো পিছুটান, কোনো বারণই তিনি মানেন নি।

মাইকেলের প্রথম হাতেখড়ি হয় ইংরেজী কবিতায়। বাংলাভাষায় কবিতা লেখা দূরের কথা বাংলায় তখন দু লাইন শুদ্ধ করে লেখবারও তাঁর ক্ষমতা ছিলো না।

সে যুগে ইংরেজকে নকল করতে গিয়েই মাইকেল নিজের দেশকে, নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে শিখলেন। আর সে ভালোবাসা যে কতো গভীর ছিলো, তার শক্তি যে কতো প্রচণ্ড ছিলো, তা আমরা দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে। যিনি দু লাইন শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারতেন না, প্রথম তাঁরই হাতে আধুনিক বাংলা কবিতার ভিত গাঁথা হলো।

মানুষ যেমন প্রথম প্রকৃতিকে নকল করতে গিয়েই নিজের মধ্যে শক্তি খুঁজে পেয়েছিলো, বাংলা সাহিত্যে অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার ঘটলো।

মাইকেলের চোখে ইংরেজ বলতে শাদা চামড়ার মানুষ নয়—পৃথিবীতে নতুন যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক। মাইকেল চেয়েছিলেন এদেশে সেই নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তার জন্যে দরকার মান্ধাতা আমলের অনড় অচল সমাজটাকে ভাঙা। তার খোল-নলচে বদলানো। পুরনো ধারণাগুলোকে উল্টিয়ে দেওয়া।

তাই মাইকেল তাঁর কাব্যে রামচন্দ্রকে হেয় করলেন আর সে জায়গায় মহিমান্বিত করে তুললেন রাবণকে। ভগবানের অবতার যে-রামচন্দ্র যুগ যুগ ধরে এদেশের হৃদয় অধিকার করে ছিলো, তাকে তিনি গদিচ্যুত করলেন আর সেই সঙ্গে গৌরবের আসনে বসালেন রাক্ষস রাবণকে। স্বর্ণলঙ্কা তাঁর চোখে দেখা দিলো ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য নিয়ে :

চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল- –চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,

রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।

এ স্বর্ণলঙ্কা পৌরাণিক রাজ্যে নয়। এ স্বর্ণলঙ্কা মাইকেলের স্বপ্নে। এদেশের স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের কোলে।

॥ বন্ধন-মুক্তি ॥

'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের কাছে আরও এক অর্থ নিয়ে ধরা দেয়। দেবকুল যেন পরদেশ-আক্রমণকারী রাজবংশ। তারা আর্য। তারা উচ্চ বর্ণের লোক। আর রাক্ষসকুল যেন দেশ-রক্ষাকারী কৃষ্ণবর্ণ অনার্য। মাইকেলের চোখে লক্ষণ কাপুরুষ, ইন্দ্রজিৎ বীর। দেবকুল হলো আক্রমণকারী ইংরেজ। আর দেশরক্ষাকারী রাক্ষসকুল হলো এদেশের মানুষ। ইংরেজ এদেশ জয় করেছে বাহুবলে নয়, ছলেবলে। আর এদেশের মানুষ বীরত্বের সঙ্গে তাকে বাধা দিয়েছে।

কোনো কল্পনাই আকাশকুসুম নয়। কল্পনা মাটি ফুঁড়েই ওঠে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লেখা হয় ঠিক তার আগেই এদেশে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে গেছে। বারুদের মতো বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে চাইছে গ্রামদেশের চাষীবাসী মানুষ। গোটা দেশের সেই বিক্ষুব্ধ হৃদয়টাকে মাইকেল তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন।

মাইকেলের কাব্যে দেশের শুধু একটি নয়, দুটি আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। একদিকে বিদেশীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি; অন্যদিকে অভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি। প্রথম আকাঙ্ক্ষার দরুন তাঁর কাব্যে নগররক্ষাকারী রাক্ষসকুলের প্রশংসা; দ্বিতীয়

আকাঙ্ক্ষার দরুন স্বর্ণলঙ্কার প্রশস্তি। মাইকেল যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার একপিঠে শৃঙ্খল-মোচন আর অন্যপিঠে অভাব মোচন-করা প্রাচুর্য।

॥ কার জয় ॥

আরও একটা কথা থেকে যায়। যক্ষপুরীর কথা। শুধু রাবণ-রাক্ষস নয়, মুদ্রা-রাক্ষসের কথা। তারই গলায় মাইকেল নতুন যুগের বরমাল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্ণলঙ্কা শুধু আক্রান্ত পুরী নয়, যক্ষপুরী। তার হার হয়।

মাইকেল তাঁর কল্পনায় দেবকুল, রাক্ষসকুল আর স্বর্ণলঙ্কাকে বারবার নানা ভাবে দেখেছেন। আধুনিক কবিতার সঙ্গে আদিম যুগের কবিতার এইখানেই তফাত। আজকের বাস্তব জটিল। তার নানা দিক। আয়নায় দেখা যায় সূর্যের এক-রঙা ছায়া। কিন্তু জহুরীর বহুমুখী হীরেয় সূর্যের সাত রং ফুটে ওঠে।

রাবণকে আর স্বর্ণলঙ্কাকে মাইকেল জিতিয়ে দেননি। জিতিয়ে দেননি এই জন্যেই যে, তাহলে সত্যকে বিকৃত করা হতো। রামায়ণে রাবণ হেরেছে বলে নয়। কেননা পৌরাণিক সত্যকে পদে পদে লঙ্ঘন করেই মাইকেল 'মেঘনাদবধ' লিখেছেন।

রাবণকে মাইকেল জিতিয়ে দেননি—পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে। পরদেশ-আক্রমণকারী ইংরেজের কাছে এদেশবাসীর হার হয়েছে। সে পরাজয় যতো বেদনাদায়কই হোক, ঐতিহাসিক সত্য।

আবার আরও একটি কারণে স্বর্ণলঙ্কার পতন ঘটেছে। তার

কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে। স্বর্ণলঙ্কা হলো গ্রহণ-লাগা যক্ষপুরী। মকররাজ রাবণ হলো মুদ্রা-রাক্ষস। আজকালকার ভাষায় বলা যায়, টাকার কুমির। নিজের রাজ্য নিজের পাপেই সে ভেঙেছে। তাই মাইকেল স্বর্ণলঙ্কাকে তার অনিবার্য পরিণাম থেকে রক্ষা করেননি।

॥ ভবিষ্যৎ স্বর্গ ॥

তবু রাক্ষসদের দিকেই মাইকেলের শেষ পর্যন্ত টান থেকে গেছে। মাটির পৃথিবীতে বর্তমানে তাদের জিতিয়ে দিতে না পারলেও তাদের জন্যে তিনি স্বর্গে জায়গা করে দিলেন, তাদের হাতে তুলে দিলেন ভবিষ্যৎ। তাই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে—

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
লড়িল মস্তকে জটা ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ……

তখন :

কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ; ……"

অবশেষে দুর্গার অনুরোধে মহাদেবের রাগ পড়লো। তিনি নিহত ইন্দ্রজিৎ ও সহমৃতা প্রমীলাকে স্বর্গে আনার জন্যে রথ পাঠালেন।

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে

দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্তি !

॥ নতুন রীতি ॥

শুধু বলবার বিষয়েই নয়, বলবার ধরনের দিক থেকেও মাইকেল বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ এনে দিলেন। তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে। মাইকেল তার পদ্যে অন্তে মিল না দিয়ে, পদের মাঝখানে মাঝখানে যতি-বিরাম দিয়ে কবিতা লিখলেন। মিল আর যতির যে নিয়ম এতোদিন ধরে চলে আসছিলো, সেই পুরনো নিয়মের বদলে তিনি নতুন নিয়মে লিখলেন। মিল আর যতির বাঁধাবাঁধি থাকলো না ; নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই পদ্যছন্দকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সনদ দেওয়া হলো।

শব্দসজ্জা ও শব্দ বাছাই করার দিক থেকেও 'মেঘনাদবধে' নতুনত্ব দেখা গেলো। বিশেষ্য আর বিশেষণ, সংজ্ঞা আর সর্বনাম, কর্তা আর ক্রিয়াকে সসম্ভ্রমে দূরে দূরে সরিয়ে রাসভারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রচলিত ধারা না মানা সত্ত্বেও মাইকেল সে যুগের পাঠকদের হৃদয় কিভাবে জয় করতে পেরেছিলেন তাঁরই একটি চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিটা ইংরেজীতে লেখা :

"অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রসঙ্গে একটা মজার ছোটো ঘটনার কথা বলি। দিন কয়েক আগে একবার আমি চীনাবাজারের দিকে

গিয়েছিলাম। এক দোকানে দেখি একজন লোক নিবিষ্টচিত্তে মেঘনাদবধ পড়ছে। ভেতরে ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী বই?' লোকটা চোস্ত ইংরেজীতে জবাব দিলো: 'একটা নতুন কবিতা পড়ছি।' আমি বললাম, 'কবিতা! তোমাদের ভাষায় আবার কবিতা আছে নাকি!' লোকটা তার উত্তরে বললো, 'এই তো কবিতা। যে কোনো দেশ এ নিয়ে গর্ব করতে পারে।'

আমি বললাম, 'পড়ো তো দেখি'। লোকটা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, 'এ লেখা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না।' আমি বললাম, 'শুনেই দেখি না কেন।' লোকটা দ্বিতীয় সর্গ থেকে পড়তে লাগলো।

লোকটা সুন্দর পড়ছিলো। যারা জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত সেজে ভড়ং করে তাদের কথা তখন আমার মনে হলো। আমি তার কাছ থেকে বইটা নিয়ে কিছু কিছু জায়গা নিজেই পড়ে শোনালাম। লোকটা তো অবাক। আমার ঠিকানা জানতে চাইলো। এড়িয়ে গিয়ে তানা-নানা করে একটা জবাব দিলাম। কেননা বাড়িতে লোকে ভিড় করুক এ আমি একদম পছন্দ করি না। ওর হাতদুটো ধরে বিদায় নিয়ে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চলবে তো?' তার উত্তরে সে বললো, "আলবত চলবে। বাংলাভাষায় এই ছন্দই সবচেয়ে জোরালো।"

পরশপাথর

এদেশে মাইকেলের হাতেই প্রথম বেজেছিলা আধুনিক কবিতার একতারা। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাজলো আধুনিক কবিতার সপ্তস্বরবীণা।

মাইকেল মোটের ওপর পুরাণের জবানিতে নিজের যুগকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বর্তমানের চোখে চোখ রেখে তাকালেন রবীন্দ্রনাথ। সামনে যা রয়েছে, তাকে প্রত্যক্ষভাবেই আঁকলেন। পুরাণ নয়, প্রকৃতি আর মানুষই হলো প্রধান। দেবদৈত্যকে মানুষ হিসেবে দেখা নয়, মানুষকেই তিনি মানুষ হিসেবে দেখলেন। নতুন যুগের মুক্তধারা যেন স্বপ্নোত্থিত ঝর্ণার মুখে গেয়ে উঠলো :

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।।
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।।

গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটিতে বাঁধলেন তাঁর কল্পনাকে। তাঁর ভালোবাসা মূর্তি পেলো জলে স্থলে রূপে রসে

শব্দে গন্ধে আলোয় অন্ধকারে। নিজেকে তিনি ছড়িয়ে চারিয়ে দিয়ে মিশে যেতে চাইলেন এই পৃথিবীরই প্রত্যেক ধূলিকণায় :

চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি—
এইসব তরুলতা গিরি নদী বন
এই চিরদিবসের সুনীল গগন
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে-অন্তরে-গাঁথা জীবনসমাজ ?

এ যদি মৃত্যু হয় তাহলে বীজের মৃত্যু। পৃথিবীতে সে মৃত্যু আনে শতসহস্র জীবনকে। মৃত্যু নয়, পুনর্জন্ম। এককে বহুগুণ করে বাড়ানো।

একদিকে দুর্দমনীয় ইচ্ছা, অন্যদিকে বাধা। একদিকে একান্তভাবে চাওয়া, অন্যদিকে পেয়ে হারানোর হাহাকার।

॥ যুগসন্ধি ॥

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। সোনারুপোয় রাজসম্পদে সে খুশি নয়। তার একমাত্র লক্ষ্য পরশপাথর।

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।

....

সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে জীর্ণচীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

দিন চলে যায়। পরশপাথর মেলে না। ক্রমে আশাও আর থাকে না। থাকে শুধু নিরন্তর খোঁজার অভ্যাস। একদিন এক গ্রামবাসী ছেলের কথায় খ্যাপার নজরে পড়ে তার কোমরের লোহার শিকল কবে যেন পরশপাথরের ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেছে। খ্যাপা কপাল চাপড়ায়। নুড়ি ভেবে কখন সে পরশ পাথর ছুঁড়ে ফেলেছে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে।—

পুরাতন দীর্ঘ পথ পরে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে
আসন্ন রজনীছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিছে সেই পরশপাথর॥

এইখানে পথের, এইখানে মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি। একটি পথ যায় পেছনে, একটি পথ সামনে। এইখানেই আধুনিক কালের যুগসন্ধি। সভ্যতার সংকট।

॥ খুঁজে পাওয়া ॥

তারপর কবির সামনে বিচিত্র 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা', পুরনো পৃথিবীর মোহভঙ্গ আর নতুন পৃথিবীর আবিষ্কার। দেশ-কাল-পাত্রকে খুঁটিয়ে জানার ভেতর দিয়েই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়। মাইকেলের পথ যেখানে হতাশায় শেষ হয়, রবীন্দ্রনাথের

পথ সেখানে নতুন আশার দিকে এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ পুরাণে ফিরে যান নি। ইন্দ্রজিতের জন্যে কল্পনার স্বর্গ গড়তে হয়নি তাঁকে। এই মাটিতেই তিনি স্বচক্ষে নতুন মানুষ, নতুন পৃথিবী দেখে এসে বললেন :

"আমাদের দুঃখী দেশে লালিত দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।" কেন বিস্ময়? —"শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে, এখানে তাই হল ; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে। পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাতহাতিয়ার স্ববশ।"

এক কথায়, পরশপাথর খুঁজে পাওয়া গেছে। পিছনে ফিরে গিয়ে নয়, সামনে এগিয়ে। সে পরশপাথর মুদ্রারাক্ষসের হাতে নয়, যক্ষের হাতে নয়—শৃঙ্খলমুক্ত বিশ্বকর্মার হাতে।

রবীন্দ্রনাথ আত্মজিজ্ঞাসার আলোয় উদ্ভাসিত করলেন কবিতার ভূতভবিষ্যতের পথ। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন :

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

হাতের সঙ্গে মাথার, কথার সঙ্গে কাজের, কবির সঙ্গে কবি-ওয়ালার, সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের হাতে হাত বাঁধার এ যেন শুধু স্বপ্ন নয়, কবির কণ্ঠে উচ্চারিত যুগ যুগ আগেকার হারানো সেই জাদুমন্ত্র। মন্ত্রের মতোই এক অলঙ্ঘনীয় আদেশ :

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি;—

এই পথেই মিলবে আমাদেরও পরশপাথর। তার ছোঁয়ায় দেশ হবে সোনার দেশ। সাহিত্য হবে সোনার কাঠি।

১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন

জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত